বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর

খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহারের ওপর
এনভায়রনমেন্ট অডিট রিপোর্ট

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রত্যয়ন	১
	মহাপরিচালকের বক্তব্য	৩
	শব্দ সংক্ষেপের তালিকা	৫-৬
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	৭-১০
১।	**নিরীক্ষার পটভূমি**	১১
	১.১ বাংলাদেশে খাদ্য দূষণ ও ভেজাল	১১-১২
	১.২ খাদ্যে ফরমালিনের প্রভাব	১২
	১.৩ ফল ও মানবদেহের ওপর ক্যালসিয়াম কার্বাইডের প্রভাব	১২-১৩
	১.৪ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত আইন কানুনসমূহ	১৩-১৪
	১.৫ খাদ্য নিরাপদ রাখার কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৪
২।	**নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলী**	১৫
	২.১ নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য (Overall Objectives)	১৫
	২.২ নিরীক্ষার আওতা (Audit Scope)	১৫
	২.৩ নিরীক্ষার ইস্যু, উদ্দেশ্য ও Criteria	১৫
	২.৪ নিরীক্ষা পদ্ধতি (Audit Methodology)	১৫
	২.৫ নিরীক্ষার জনবল (Audit Resources)	১৬
	২.৬ নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) সংক্রান্ত	১৬
৩।	**নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ও সুপারিশমালা**	১৬-৩৮
৪।	**পরিশিষ্টসমূহ (১-৪)**	৩৯-৫১

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন, ১৯৭৪ এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত কার্যাবলী) (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো ।

তারিখ: ১৬/০৭/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৩১/১০/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে আমাদের দেশে ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনিরাপদ ও ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে ডায়রিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের জটিল রোগ যেমন, ক্যান্সার এর মত মারাত্মক ও দীর্ঘমেয়াদী রোগের কারণে প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। খাদ্য গ্রহণ জনিত অসুস্থ্যতা ও মৃত্যুর হার কমানোর জন্য অনিরাপদ, বিষাক্ত ও ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ ভেজাল খাদ্য গ্রহণ থেকে জনগণকে নিবৃত্ত রাখা আবশ্যক।

জনগণের জন্য নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজন একটি কার্যকর জাতীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা খাদ্য পরিদর্শন ও এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করবে। প্রচলিত আইন ও বিধিসমূহের কিছু দূর্বলতা, কার্যকর মনিটরিং ও আইনের প্রয়োগ না থাকা এবং ভোক্তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতা না থাকায়, খাদ্য উৎপাদনকারী ও সম্পৃক্ত খাদ্য ব্যবসায়িরা ব্যাপকভাবে খাদ্যে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করছে, এমন কি খাদ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে পরিবেশনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

উল্লেখ্য যে, অক্টোবর ২০১৩ খ্রিঃ নতুন "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ " প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়কে "নোডাল মন্ত্রণালয়ের" দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ আইন অনুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয়, "ন্যাশনাল ফুড সেফটি এ্যাডভাইজারি কাউন্সিল" গঠন ও এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা করার কথা। এছাড়াও উল্লেখ্য যে, নিরাপদ খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের সদস্যগণ সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে এবং এতে সভাপতিত্ব করবে খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে. সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নির্দেশ ক্রমে পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহার এর ওপর এনভায়রনমেন্ট অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করে। নিরীক্ষাটি Govt. Auditing Standard সহ প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। রিপোর্টটিতে বর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে নিরাপদ খাদ্যসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ: ১৬/০৭/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৩১/১০/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
মোহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভূঁঞা

মহাপরিচালক
পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

শব্দ সংক্ষেপ (List of Abbreviations)

BARC	Bangladesh Agricultural Research Council.
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute.
BCSIR	Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research.
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution.
CaC2	Calcium Carbide.
CECA	Control of Essential Commodities Act.
CRPA 2009	Consumer Right Protection Act, 2009.
CRP	Consumer Right Protection.
CPFA	Cantonments Pure Food Act.
DAE	Department of Agriculture Extension.
DC	Deputy Commissioner.
DCRP	Directorate of Consumer Right Protection.
DG	Director General.
DGHS	Directorate General of Health Services.
DOE	Department of Environment.
DOF	Department of Fisheries.
DMP	Dhaka Metropolitan Police.
DFO	District Fisheries Officer.
DSI	District sanitary Inspector.
FA	Food Act.
FAO	Food and Agricultural Organization.
FBCCI	Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries
FIQC	Fish Inspection and Quality Control.
GOB	Government of Bangladesh.
ICDDRB	International Centre for Diarrhoeal Diseases Research, Bangladesh.
INCOSAI	International Congress of Supreme Audit Institutions.
INTOSAI	International Organization of Supreme Audit Institutions.
IPH	Institute of Public Health.
ISSAI	International Standards for Supreme Audit Institutions.
MOC.	Ministry of Commerce.

MOHFW	Ministry of Health and Family Welfare.
MOI	Ministry of Industries.
MOLGRD & C	Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives.
NCRP	National Consumer Right Protection.
NFSAC	National Food Safety Advisory Council.
NFSL	National Food Safety Law.
NGO	Non-Government Organization.
OCAG	Office of the Comptroller and Auditor General.
PC	Penal Code.
PFO	Pure Food Ordinance.
PGR	Plant Growth Regulator.
PHL	Public Health Law.
PSR	Preliminary Survey Report.
R&D	Research and Development.
SPA	Special Powers Act.
SRO	Statutory Regulatory Order.
UFO	Upazilla Fisheries Officer.
UNO	Upazilla Nirbahi Officer.
WHO	World Health Organization.

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

এ নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের অবৈধ ও ক্ষতিকর ব্যবহার রোধে ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা যাচাই করা এবং এর আলোকে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা যা বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহকে আরও কার্যকর ও সুসংহত করবে।

বর্তমানে খাদ্যে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ নিরীক্ষায় মূলত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহার রোধে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দূর্বলতা চিহ্নিত করার প্রয়াস করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, খাদ্য ভেজালে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হওয়ায়, নিরীক্ষায় কেবল এ দু'টি রাসায়নিক পদার্থের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পৃথিবীর যে কোন দেশের মত বাংলাদেশেও খাদ্যের উৎপাদন, বিতরণ থেকে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত রয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক। তাই প্রতিটি স্তরে সকল ক্ষেত্রের কার্যাবলী যাচাই করা নিরীক্ষার পক্ষে যেমন অসম্ভব তেমনি গুরুত্বপূর্ণও নয়। তবে নিরীক্ষায় খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তর থেকে যৌক্তিক ও প্রতিনিধিত্ব মূলক নমুনায়নের মাধ্যমে বিষয়টিকে যাচাই করা হয়েছে। নমুনায়নের ভিত্তিতে ২৮টি বাজার ও ৪৯ টি ইউনিটে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় (যার বিস্তারিত বিবরণ সংযুক্তি-১, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৮) এবং জানুয়ারী/২০১৪ হতে নভেম্বর/২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে নিরীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল দলিলাদি পর্যালোচনা (Documents Review) তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল- ডাইরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস), সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারীজ (ডিওএফ) এবং অন্যান্য সেবাগ্রহীতাগণ। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ও পরিদর্শন করা হয়। অধিকাংশ নিরীক্ষায় দৈবচয়ন পদ্ধতির (Random) মাধ্যমে সংগৃহীত ফল, মাছ ও দুধের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে, বিভিন্ন পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে এতে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ভেজাল যাচাই করা হয়েছে।

সমগ্র নিরীক্ষা কার্যক্রমেধ ইন্টারন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ডস্ ফর সুপ্রিম অডিট ইনষ্টিটিউশনস্ (ISSAI) guidelines ৩০০, ৩০০০, ৩১০০ এবং ৫১১০ (যা পারফরমেন্স এবং এনভায়রনমেন্ট অডিটের জন্য প্রযোজ্য) সহ Govt. Auditing Standars অনুসরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণসমূহঃ

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণসমূহকে তিনটি প্রধান ইস্যুর আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে, ইস্যুসমূহ হলো-

নিরীক্ষা ইস্যু-১ ঃ খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ক্ষতিকর ব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে কিনা ?

নিরীক্ষা ইস্যু-২ ঃ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা ?

নিরীক্ষা ইস্যু-৩ ঃ খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ভেজাল রোধে প্রয়োজনীয় কারিগরী সক্ষমতা আছে কিনা ?

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ঃ

- পুরো খাদ্য চেইন অর্থাৎ খামার/উৎপাদন স্থল থেকে ভোক্তার টেবিল পর্যন্ত খাদ্য নিরাপদ রাখার সার্বিক বিষয়টিকে মনিটরিং ও সমন্বয়ের জন্য কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা দায়িত্বরত নেই। বর্তমানে ১১টি মন্ত্রণালয় তাদের সীমাবদ্ধ আওতায় ও কর্তৃত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে খাদ্য নিরাপদ করার বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত।

- বিভিন্ন খাদ্যে ফরমালডিহাইড/ফরমালিনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ফরমালডিহাইড/ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের আমদানি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন "ডাইরেক্টরেট অব কনজ্যুমার রাইটস্ প্রটেকশন" (ডিসিআরপি) কার্যালয়ের মাঠ-পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো এবং এ সংক্রান্ত বাজেটের স্বল্পতা থাকায় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না।"জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিল" কর্তৃক আইনের প্রবিধানের চেয়ে ৫০% এরও কম সংখ্যক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বর্তমানে ভোক্তার অভিযোগ করার প্রক্রিয়াটি সহজ নয় এবং এ সংক্রান্ত ব্যয়ও ভোক্তাকেই বহন করতে হয়। সর্বোপরি এ সংক্রান্ত বিভাগীয়, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটিগুলো কার্যকর নয়।

- স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণও এ সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না। অভ্যন্তরীণ বাজারের মাছের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের মৎস্য কার্যালয়সমূহের পরিদর্শকদের যথেষ্ট কারিগরী দক্ষতা ও সহায়তা নেই। স্থল বন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানিকৃত খাদ্যে ফরমালিন কিংবা অন্য কোন বিষাক্ত পদার্থের অস্তিত্ব সনাক্তকরণে শুল্ক পরিদর্শকদের গৃহিত কার্যক্রমের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

- ২০১৩ সালের নিরাপদ খাদ্য আইনের প্রভিশন অনুযায়ী "খাদ্য আদালত" সমূহ এখনও কার্যকর নয় এবং এখন পর্যন্ত কোন "পাবলিক এনালিষ্ট অব ফুড" নিয়োগ করা হয়নি। খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর ব্যবহারের একটি অন্যতম কারণ হলো, "কোল্ড চেইন" এর যথেষ্ট অবকাঠামো গড়ে না ওঠা। দূর্বল মনিটরিং, সমন্বয়ের অভাব, কার্যকর জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম না থাকা এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয়ায় বর্তমান এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

- পরীক্ষাগারগুলোর বিভিন্ন রকম খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল পরীক্ষা করার একই ধরণের সক্ষমতা নেই আবার পরীক্ষা করানোর খরচও অনেক। কোন পরীক্ষাগারেরই খাদ্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর ভেজাল নির্ণয় করার সক্ষমতা নেই। সংগৃহিত নমুনা গুলোর ফরমালিনের মাত্রা পরিমাপের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পরীক্ষাগারের পরীক্ষার ফলাফলে কোন মিল পাওয়া যায় নি।

- ফরমালিনের মাত্রা পরিমাপের জন্য বাজারে মাত্র দু'ধরণের কিটস প্রচলিত আছে, কিন্তু দুটি পদ্ধতিরই উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফরমালিন চিহ্নিত করার মেশিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় আইন সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়নি, এমনকি সঠিক মেশিনও ক্রয় করা হয়নি।

কারণসমূহ ঃ কেন্দ্রীয় সংস্থা না থাকার কারণে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালডিহাইড/ফরমালিনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা স্থির করার লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি এবং বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে দেখা হচ্ছে না। "ন্যাশনাল ফুড সেফটি এডভাইজারি কাউন্সিল" (NFSAC) গঠন করার বিষয়ে এখন পর্যন্ত খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ফরমালিন আমদানি সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত Statutory Regulatory Orders সমূহ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না। কেননা ফরমালিন, ফরমালডিহাইডের গ্রুপের ভিন্ন নামে আমদানি করা হচ্ছে। এছাড়া লোকবল, অর্থ ও কারিগরি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে ডিসিআরপি আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না। অন্যদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও যথাযথভাবে ডিসিআরপি'র কার্যক্রমকে মনিটরিং করছে না। ভোক্তারা কোন বিষয়ে অভিযোগ করতে চাইলে, অভিযোগ দাখিল করার প্রক্রিয়াটি একদিকে যেমন জটিল অন্যদিকে ব্যয়সাধ্যও। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলোর কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকী করা হচ্ছে না এবং এর সদস্যগণও স্বেচ্ছায় কমিটির বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে না।

এ সংক্রান্ত শুল্ক বিভাগের পরিদর্শন কার্যক্রম অপর্যাপ্ত ও অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় "কোল্ড চেইন" এর অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হচ্ছে না। এমনকি সামগ্রিকভাবে "ফুড চেইন" বিষয়টিকেও বিবেচনা করা হচ্ছে না। এছাড়া এ ধরণের অপরাধ রোধে বিভিন্ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারা এবং দোষীদের কোন দৃষ্টান্তমূলক সাজা প্রদান না করাও এর অন্যতম কারণ।

অন্যদিকে পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ও অনেক বেশী। পরীক্ষাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতা (Capacity) ও পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত টেষ্টিং কিটস্সমূহেরও যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে । ফলে নির্ণীত ফলাফল নিয়েও রয়েছে জটিলতা। এমনকি জেড-৩০০ ফরমালিন টেষ্টিং কিটস্ ক্রয় করার ক্ষেত্রে সংগ্রহকারী/ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ায় পিপিআর সঠিকভাবে অনুসৃত হয়নি।

ফলাফলঃ খাদ্যকে নিরাপদ রাখার জন্য ১১টি মন্ত্রণালয় খণ্ডিত/বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। অধিকন্তু, ফরমালডিহাইড/ফরমালিনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কি হবে সে ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি থাকায় আইন প্রয়োগও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

খাদ্য দ্রব্যে বহুলভাবে ভেজাল দ্রব্য হিসেবে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংসদে ডিসিআরপি'র বাৎসরিক প্রতিবেদন নিয়মিত জমা না হওয়ায় মহান জাতীয় সংসদও এ প্রতিষ্ঠানের খাদ্যে ভেজাল রোধ সংক্রান্ত কার্যক্রমের কোন মূল্যায়ন করতে পারছে না। জনগণও প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিও জনগণের প্রয়োজনকে সঠিকভাবে নির্ণয় ও সমাধান করতে পারছে না।

খাদ্যের ভেজাল চিহ্নিত করার পরীক্ষাগুলো কার্যকর নয়। আবার সময়মত এর প্রতিবেদনও পাওয়া যায় না। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের মাছের ফরমালিন রোধে তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

সর্বোপরি, মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন দূর্বলতা, আইনের কঠোর প্রয়োগ না থাকা, দূর্বল মনিটরিং, ফরমালিন ও কার্বাইডের সহজলভ্যতা প্রভৃতি কারণে খাদ্যে বিভিন্নভাবে বিষাক্ত পদার্থ দু'টির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও।

সুপারিশসমূহঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়কে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমুহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে-

- বিভিন্ন খাদ্যের ক্ষেত্রে ফরমালডিহাইড/ফরমালিনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণের ব্যাপারে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;
- খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় "কোল্ড চেইন" এর অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- খাদ্য ভেজাল রোধে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক খাদ্য চেইনের প্রতিটি ধাপকে সমন্বিতভাবে এবং কার্যকরভাবে মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে। খাদ্য ভেজাল বিরোধী কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি, আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
- ফরমালিন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কীটস্ এর ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি এর পর্যাপ্ততা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ও ভোক্তাদের সামর্থ্যের মধ্যে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- খাদ্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ভেজাল চিহ্নিত করার কারিগরী কৌশল অর্জন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- বিভিন্ন পরীক্ষাগার সমূহের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণযোগ্য ষ্টান্ডার্ড নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।
- Public Analyst Of Food নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে ঃ

- ফরমালিন আমদানি নিয়ন্ত্রনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে "ডিসিআরপি"কে শক্তিশালী ও এর বাৎসরিক পারফরমেন্স রিপোর্ট নিয়মিতভাবে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে;
- ডিসিআরপি'র কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং এবং এর বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসমূহের প্রয়োজনীয় সভা সমূহ যাতে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- ভোক্তাদের অভিযোগ করার প্রক্রিয়াকে সহজতর এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় মওকুফ অথবা ভোক্তাদের সাধ্যের মধ্যে নির্ধারণ করতে হবে;
- ডিসিআরপি'র বিভিন্ন পর্যায়ের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন কমিটিগুলোর কার্যাবলী তদারকী ও তত্ত্বাবধান জোরদার করতে হবে এবং এতে জড়িত ব্যক্তিগণ কি কারণে এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করছেন না তার কারণসমূহও চিহ্নিত করতে হবে।
- **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে** শূন্য পদগুলো পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা (Logistic Support) বৃদ্ধির সাথে সাথে নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা পদ্ধতি, রিপোর্টিং এর মান উন্নয়নসহ, প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং সে সাথে আইন প্রয়োগের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে হবে।
- **শুল্ক কাষ্টম কর্তৃপক্ষকে** নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনসহ স্থল বন্দর সমূহের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহ, পরিবহণ ও ফলাফল সংগ্রহে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।
- পিপিআর না মানার জন্য **মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে** প্রকিউরমেন্ট এনটিটির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহারের ওপর এনভায়রনমেন্ট অডিট

১. নিরীক্ষার পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় নিরীক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ সহায়তায় "ষ্ট্রেনদেনিং পাবলিক এক্সপেনডিচার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (SPEMP-B) এর নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের "পরিবেশগত পারফরমেন্স নিরীক্ষা" সম্পাদনে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়েই SPEMP-B প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য নিরীক্ষাটি সম্পাদন করা হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ফুড সামিট (১৯৯৬) ঃ ওয়ার্ল্ড ফুড সামিট (১৯৯৬) অনুসারে যখন একটি দেশের জনগণের কর্মময় ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করার জন্য তার পছন্দ ও চাহিদানুসারে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং তা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে তখনই কেবল খাদ্যের নিরাপত্তা রয়েছে, বলা যাবে। সেই সাথে ব্যক্তির পছন্দ ও সুস্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যের উৎপাদন থেকে বন্টন পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১.১ বাংলাদেশে খাদ্য দূষণ ও ভেজালঃ

আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নিরাপদ খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য দূষণ ও ভেজাল এদেশের নিরাপদ খাদ্য ও জনস্বাস্থ্যের একটি অন্যতম হুমকি যা কিনা বিভিন্ন রোগের যেমন-ডাইরিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের ক্যানসারের কারণ । প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ এ ভেজালযুক্ত খাবার খেয়ে ক্যান্সার, কিডনীর সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে, এমনকি শিশু ভূমিষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WHO) এর হিসাব মতে, ভেজাল খাদ্য ও দূষিত পানির দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া রোগের কারণে প্রতিবছর পৃথিবীতে ২.২ মিলিয়ন মানুষ মারা যাচ্ছে। যার মধ্যে ১.৯ মিলিয়ন হলো শিশু। নিয়মিত মনিটরিং না থাকায় বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্যের প্রভাব সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। তবে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ (ICDDRB) এর মতে গড়ে প্রতিদিন ৫০১ জন রোগী খাদ্য ও পানি বাহিত দূষণের কারণে সৃষ্ট ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার জন্য গিয়ে থাকে।

খাদ্যে ভেজাল রোধ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে এ ধরণের রোগের কারণে মৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। অন্যদিকে ২০১৫ সালের মধ্যে অপুষ্টি ও দারিদ্রতা হ্রাসের জাতিসংঘের মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সহ নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। আর তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ে একটি কার্যকরী খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে নিয়মিত পরিদর্শন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য দূষণের একটি সাধারণ চিত্র হলো উৎপাদনকারী ও বিক্রয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় না করা, কার্যকর মনিটরিং এবং আইনের যথার্থ প্রয়োগ না থাকা এবং সর্বোপরি জনগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন না থাকায় বাংলাদেশে সর্বত্র ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বিষাক্ত উপাদান মিশিয়ে ভেজাল খাদ্য তৈরি করা হচ্ছে। এই নিরীক্ষায় নিরাপদ খাদ্যের ক্ষেত্রে হাজারও ঝুঁকির মধ্যে মাত্র দু'টি ঝুঁকি **ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডকে** বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা এ দু'টি বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য বহুলভাবে খাদ্য ভেজালে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জনগণও তুলনামূলকভাবে এ দু'টি রাসায়নিক পদার্থের সাথে বেশী পরিচিত।

গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০১২ (৮ ই আগষ্ট, ২০১২তে প্রকাশিত) এর মতে, খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ১০৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১ তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও অবস্থান সর্ব নিম্ন স্থানের চেয়ে মাত্র এক ধাপ ওপরে। বাংলাদেশের ১৬৬.৭ মিলিয়ন জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নিয়ে, ইকোনমিক ইন্‌টিলিজেন্স ইউনিট এর হিসাব মতে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বিক স্কোর ১০০ এর মধ্যে মাত্র ৩৪.৬, যা কিনা মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা, ভারত পাকিস্তান, মায়ানমার এবং নেপাল থেকে কম। উল্লেখ্য যে, সার্বিক সূচকটি ২৫টি মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছিল। মাপকাঠিগুলো মূলত ৩টি প্রধান বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রথমটি ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় (এ্যাফরডেবিলিটি), এতে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৩৩ এবং অবস্থান ছিল ৭৮ তম, সহজলভ্যতা বিবেচনায় (এভেইলেবিলিটি), স্কোর ছিল ৩৭.৬ এবং অবস্থান ৮১ তম এবং নিরাপদ খাদ্য ও গুনগতমান বিবেচনায় বাংলাদেশের স্কোর ছিল মাত্র ৩০.৪ এবং অবস্থান ৯২ তম।

নিরাপদ খাদ্যের অন্যতম ঝুঁকি হলো ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড। নিম্নে এদের প্রভাব আলোচনা করা হলো ঃ

১.২ খাদ্যে ফরমালিনের প্রভাবঃ

ফরমালিনের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয় ফল **আমে** স্প্রে এর মাধ্যমে প্রয়োগ। সাধারণত বাজারজাতকরণের পূর্বে অথবা কোন এক পর্যায়ে স্প্রে করা হয় আমের জীবনকাল বৃদ্ধি করার জন্য, নয়ত আম তুলনামূলক কম সময়ে পঁচে যায়।

শুধু আম নয় অন্যান্য খাদ্যেও এর বহুল ব্যবহারের এর ফলে স্বাস্থ্যগত মারাত্মক ঝুঁকির সৃষ্টি হচ্ছে। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "ন্যাশনাল টক্সিকোলজি প্রোগ্রাম (২০১১)"** এর মতে- ফরমালিন হলো একধরণের রং বিহীন তীব্র গন্ধযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য যা কিনা পানিতে দ্রবীভূত ফরমালডিহাইড গ্যাস থেকে উদ্ভুত হয়। এর গ্যাস নাক, চোখ ও শ্বাস প্রশ্বাসে জ্বালা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, হাঁচির উদ্রেক করে এমনকি এর কারণে ফুসফুসের সমস্যাসহ ব্রন্‌কাইটিস, নিউমোনিয়াও হয়ে থাকে। এ ধরণের একাধিক সমস্যা অ্যাজমা রোগের কারণ হয়। এটি বিভিন্ন অ্যালার্জি ও চর্ম রোগের সৃষ্টি করে শরীরের চামড়ার ক্ষতি করে থাকে। এর অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে শরীরের অভ্যন্তরে ক্ষত ও প্রদাহের সৃষ্টি হয়, সেই সাথে প্রচন্ড ব্যথাও হয়। এতে করে বমিবমিভাব, রক্তবমি, রক্ত মল সহ ডায়রিয়া, মূত্রের সাথে রক্ত, মাথাঘোরা, রক্ত সঞ্চালনের সমস্যাসহ মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায়, ফরমালিন কিডনী, লিভার ও ফুসফুসের সমস্যাসহ ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে থাকে।

১.৩ ফল ও মানবদেহের উপর ক্যালসিয়াম কার্বাইডের প্রভাবঃ

অধিকাংশ ফল বিক্রেতা ফল পাকানোর জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে বিক্রেতারা সাধারণত যা করে থাকে, তা হলো, অল্প পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বাইড একটি ছোট প্যাকেটে ভরে ফলগুলো যেখানে স্তুপ করে রাখা হয়, তার কাছাকাছি কোথাও রেখে দেয়। এতে করে ফলগুলোতে থাকা জলীয় বাষ্পের সাথে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ ও অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয় যা কিনা ফল পাকার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। বিক্রেতারা সাধারণত ফল পরিবহণের সময় ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করে থাকে, যাতে করে বিক্রয় স্থানে আসার পর ফলগুলো পাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। ২০০৯ সালে **"ন্যাশনাল ফুড পলিসি ক্যাপাসিটি স্ট্রেনদেনিং প্রোগ্রাম" এর আওতায় সবজী ও কলা উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ পর্যায়ে রাসায়নিক পদার্থ** ও হরমোনের ব্যবহার ও এর প্রভাব শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় ৭৪% পাইকারী কলা ব্যবসায়ী ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মত বিভিন্ন ধরণের ফল পাকানোর রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা এতে রয়েছে ক্ষতিকর আর্সেনিক ও ফসফরাস। এর ফলে হাত ও পায়ে বোধহীনতা অনুভূত হয় ও দূর্বল বোধ হয়, চামড়া শুষ্ক হয়ে যায়, রক্ত চাপ কমে যায়। সবচেয়ে জরুরী যে বিষয়টি তা হলো -**ফসফরাস ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব গুরুতর না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ পায় না। এমনকি এ ধরণের ফল গ্রহণের ফলে গর্ভবতী মায়ের গর্ভপাত পর্যন্ত হতে পারে।**

এছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো ফল অতিরিক্ত নরম ও কম সুস্বাদু হয়। কেননা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহারের ফলে স্বাভাবিকভাবে যে প্রক্রিয়ায় ফল পেকে থাকে, তার চেয়ে দ্রুত সময়ে ফল পেকে যায়। এতে করে ফল কম সুস্বাদু এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিষাক্ত হয়। কৃত্রিমভাবে পাকানো ফলগুলো বাইরে থেকে হলুদাভ হলেও ভিতরে কাঁচা থেকে যায়। এভাবে ফল পাকানো হলে ২-৪ দিনের মধ্যেই ফল পচে যায়।

১.৪ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত আইন কানুন সমূহ ঃ

দীর্ঘদিন যাবত নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ড "নিরাপদ খাদ্য আইন, ১৯৫৯" এবং "নিরাপদ খাদ্য অর্ডিন্যান্স ১৯৬৭" এর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। পরবর্তীতে আইনটি আরও দু'বার সংশোধন করা হলেও এ সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স সংশোধনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রয়োজনীয় রুলস্ রেগুলেশনও তৈরী করা হয়নি। ২০০৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর। পরবর্তীতে এ দায়িত্ব দেয়া হয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে। ২০১৩ সালে পুনরায় এই দায়িত্ব দেয়া হয় খাদ্য মন্ত্রণালয়কে।

অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিঃ নতুন "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ " প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়কে "নোডাল মন্ত্রণালয়ের" দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ আইন অনুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয়, "ন্যাশনাল ফুড সেফটি এ্যাডভাইজারি কাউন্সিল" গঠন ও এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা করার কথা। এছাড়াও উল্লেখ্য যে, নিরাপদ খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের সদস্যগণ সমন্বয়ে এ কাউন্সিল গঠিত হবে এবং এতে সভাপতিত্ব করবেন খাদ্য মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে, নিরাপদ খাদ্য বিষয়টির সাথে বিভিন্নভাবে একাধিক মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত এবং এক্ষেত্রে তারা তাদের নিজস্ব ম্যানডেটের আওতায় বিভিন্ন Legislation, Rules and Regulation দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে; যার মধ্যে অন্যতম হলো-

- বাংলাদেশ পেনাল কোড, ১৮৬০ (সম্পর্কিত সেকশন-২৬৮-২৯৪)
- নিরাপদ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯
- নিরাপদ খাদ্য (সংশোধিত) আইন, ২০০৫
- জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৬
- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১০
- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩
- স্থানীয় সরকার (মিউনিসিপালিটিস) অর্ডিন্যান্স, ২০০৮
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অর্ডিন্যান্স, ২০০৮
- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এবং সংশোধনীসমূহ
- ষ্টান্ডার্ড অব ওয়েট এন্ড মেজারস (সংশোধিত) আইন, ২০০১

- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ অব ওয়েট এন্ড মেজারস (প্যাকেজড কমোডিটিস) বিধি, ২০০৭
- পণ্য মোড়কীকরণ নীতি, ২০০৬
- মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য (ইন্সপেকশন এবং মান নিয়ন্ত্রন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য (ইন্সপেকশন এবং মান নিয়ন্ত্রন) বিধি (সংশোধিত) ২০০৮
- মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য বিধি, ২০০৯
- অভ্যন্তরীন খাদ্য সংগ্রহ বিধিমালা
- বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস্ (বিডিএস) অব বিএসটিআই
- আমদানী নীতি, ২০০৯-১৩
- আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০
- মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

১.৫ খাদ্য নিরাপদ রাখার কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

নিরাপদ খাদ্য এবং মান নিয়ন্ত্রণের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত। যে সকল মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ এজেন্সী এবং বিভাগ সমূহ এই কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জড়িত নিম্নে তাদের তালিকা উল্লেখ করা হলো-

মন্ত্রণালয়	এজেন্সি/বিভাগসমূহ
১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)
২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ডাইরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস)
৩। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা সমূহ
৪। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য অধিদপ্তর
৫। খাদ্য মন্ত্রণালয়	খাদ্য অধিদপ্তর
৬। অর্থ মন্ত্রণালয়	ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ
৭। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট/এবং মোবাইল কোর্ট
৮। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিসিএসআইআর
৯। কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১০। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পুলিশ সদর দপ্তর

নিরীক্ষায় মূলত ১, ৩, ৪, ৫, ও ৮ এ বর্ণিত মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলী

২.১ নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য

ক) নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহার রোধে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন; এবং

খ) মূল্যায়নের আলোকে বর্তমান অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

২.২ নিরীক্ষার আওতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাদ্যে ভেজাল হিসেবে একাধিক ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নিরীক্ষায় কেবল মাত্র ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ব্যবহার রোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নের ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্যের পরিবহণ, বিপনন এবং ভোক্তার কাছে বিক্রয় পর্যন্ত একটি বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। নিরীক্ষার পক্ষে এ সম্পর্কিত প্রতিটি স্থান নিরীক্ষা করা সম্ভবপর নয় এবং প্রয়োজনীয়ও নয়। একটি যৌক্তিক নমুনায়নের মাধ্যমে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহার রোধে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ কতখানি কার্যকর তা নিরীক্ষা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে নমুনায়নের জন্য যে Criteria গুলো অনুসরণ করা হয়েছে, তা হলো-

- নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় সমূহ, বিভিন্ন স্তর অর্থাৎ মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তর থেকে ইউনিট নমুনার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।
- আকার, কার্যক্রম ও ভৌগোলিক অবস্থানও নমুনায়নের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

এই নিরীক্ষায় রিসোর্স এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন স্তরের মোট ৪৯টি ইউনিট এবং ২৮টি বাজার মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়।

২.৩ নিরীক্ষার ইস্যু, উদ্দেশ্য ও Criteria (পরিশিষ্ট-২, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০ এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে)।

২.৪ নিরীক্ষা পদ্ধতি

নিরীক্ষায় দলিলাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা ছাড়াও এর পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতকারও গ্রহণ করা হয়েছে। নিরীক্ষায় বেশ কিছু বাজার বাস্তব পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ফল, মাছ, দুধ ও ফলের জুস এর দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে এতে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ভেজাল রয়েছে কিনা। নিরীক্ষায় ইন্টারন্যাশনাল ষ্টান্ডার্ডস্ অব সুপ্রিম অডিট ইন্সটিটিউশন (ISSAI) ৩০০,৩০০০,৩১০০ এবং ৫১১০ (যা কিনা পারফরমেন্স নিরীক্ষা ও পরিবেশ নিরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য) অনুসরণ করা হয়েছে।

২.৫ নিরীক্ষার জনবল

নিরীক্ষা দল

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও অফিস
১	জনাব তানভির আক্তার হোসেন খান	পরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর।
২	জনাব মির্জা মোঃ তারেখ আলী	উপ-পরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর।
৩	জনাব মোহাম্মদ কবির হোসেন	সহকারী পরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর।
৪	জনাব আনোয়ারা সুলতানা	অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর।
৫	জনাব এ, কে, এম, জসীম উদ্দীন	অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর।

পরামর্শক

- জনাব রাজেশ দয়াল, এস,পি,ই,এম,পি-বি, পারফরমেন্স অডিট স্পেসালিষ্ট।
- জনাব নূরুন নবী খান, সিনিয়র ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট।

সার্বিক তত্ত্বধানে ঃ মহাপরিচালক, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর।

২.৬ নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) ঃ

অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্টটি (AIR) খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর ২১/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ইস্যু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২৫/০৩/২০১৫ খ্রিঃ এ তাগিদপত্র এবং ০১/০৬/২০১৫ খ্রিঃ এ ডি.ও লেটার প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

৩. নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণসমূহ ও সুপারিশমালা ঃ

নিরীক্ষা ইস্যু ০১ ঃ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে কিনা ?

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ১.১ সামগ্রিকভাবে পুরো খাদ্য চেইন অর্থাৎ উৎপাদন স্থান থেকে ভোক্তার টেবিল পর্যন্ত খাদ্য নিরাপদ রাখার জন্য কোন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা দায়বদ্ধ নয়। একাধিক মন্ত্রণালয় সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে যার যার সীমাবদ্ধ ম্যানডেটের মধ্যে খন্ডিত ভাবে দেখছে।

বিবরণ ঃ দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপদ খাদ্যের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করা হয়নি। বর্তমানে কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা নেই, যাকে সামগ্রিকভাবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়বদ্ধ করা যায়। ১১টি মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এক একটি মন্ত্রণালয় খাদ্য চেইনের বিভিন্ন স্তরে কাজ করছে আবার মন্ত্রণালয়সমূহ ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধ ম্যানডেটের আলোকে কাজ করে থাকে। এতে করে প্রতিটি মন্ত্রণালয় পুরো বিষয়টিকে তাদের মত করে খন্ড খন্ড ভাবে তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে সামগ্রিকভাবে খাদ্য চেইনের পুরো বিষয়টিকে সমন্বয় করা হচ্ছে না।

অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিঃ এ নতুন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে উপরে বর্ণিত শূন্যতা দূর করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রনালয়কে "নোডাল মন্ত্রণালয়ের" সামগ্রিক সমন্বয়, তদারকী ও নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ নতুন ভূমিকার আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয়কে "ন্যাশনাল ফুড সেফটি এ্যাডভাইজরি কাউন্সিল" গঠন এবং এর সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কাউন্সিলই মূলত জাতীয় পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবে।

কাউন্সিলটি ২৯ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর অভিমত প্রকাশ করবে।

- নিরাপদ খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি এবং আইনের বাস্তবায়ন;
- খাদ্যের পুষ্টিমান, বিশুদ্ধতা এবং সর্বোপরি নিরাপদ খাদ্যের গুনগতমান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ (জাতীয় কোডেক্স ষ্ট্যান্ডার্ড) সম্পর্কিত বিষয়াবলী;
- এ আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি কোন প্রযুক্তিগত ও প্রয়োগগত জটিলতার উদ্ভব হয়, সে বিষয়ে মতামত প্রদান;
- সেবা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকবলের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ, গুনগতমান সম্পন্ন ও বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধার বিষয়ে মতামত প্রদান এবং
- নিরাপদ খাদ্য এবং এর মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত নীতি ও কৌশল বিষয়ে মতামত প্রদান।

এছাড়াও এ আইনে **"বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি"** এবং **"সেন্ট্রাল ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি"** গঠন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষাকালীন সময়ে দেখা যায় যে, **খাদ্য মন্ত্রণালয়** তখন পর্যন্ত **"ন্যাশনাল ফুড সেফটি অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল", "বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি"** এবং **"সেন্ট্রাল ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি"** সমূহ গঠন করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রুলস ও রেগুলেশনও প্রণয়ন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ ঃ খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ সমস্ত কার্যক্রমকে যথেষ্ট অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্পর্কিত কার্যক্রমটি মূলত খন্ড খন্ড ভাবে ১১টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হচ্ছে।

ফলাফলঃ আইনের বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হচ্ছে ফলে আইনের সুবিধা থেকে জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে এবং খাদ্যে ভেজাল রোধ করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

সুপারিশঃ এক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করতে হবে। সে সাথে **"কেন্দ্রিয় ফুড সেফটি এ্যাডভাইজরী কাউন্সিল** সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটিসমূহ জরুরী ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গঠণের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ১.২ ঃ বিভিন্ন খাদ্যে ফরমালিন এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

বিবরণ ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, খাদ্যে ফরমালিন এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা হবে "শূন্য"। কিন্তু নিরীক্ষাকালীন সময়ে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, মাঠ পর্যায়ে ফরমালিন এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা নিয়ে ভিন্নতা রয়েছে।

অন্য দিকে **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান অনুষদ** এবং বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্স কাউন্সিল **(BARC)** এর মতে কোন কোন খাদ্যে প্রকৃতিগতভাবেই ফরমালডিহাইড থাকে। যদিও এক্ষেত্রে কোন গবেষণা করা হয়নি যে, প্রকৃতিগতভাবে কোন খাদ্যে কি পরিমাণ ফরমালডিহাইড রয়েছে।

বিএআরসি'র একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানব দেহে কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ ফরমালডিহাইড রয়েছে যা কিনা মানবদেহের মেটাবলিজম এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় এটি গ্রহণ করা হয়, তবে ফরমালডিহাইড ফরমিক এসিডে রূপান্তরিত হয় এবং ইউরিনের মাধ্যমে তা শরীর থেকে বের হয়ে যায়। ফরমালডিহাইড এর কিছু অংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় যা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার ইউরোপ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী সাধারণত খাদ্য ও সবজীতে ৩-৬০ মাইক্রোগ্রাম (এমজি)/কেজি, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যে ১ এমজি/কেজি এবং মাংস ও মাছ এ ৬-২০ এমজি/কেজি ফরমালডিহাইড থাকে। মানব দেহে এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা কি হবে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি পরিমাপ করা বেশ জটিল, তবে একটি আনুমানিক ধারণা দেয়া হয়েছে, একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ১.৫-১৪ এমজি/দিন। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, বিধি ৮ (জি) তে বলা হয়েছে এক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থাকে ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়াও এস আরও নং ২৩৫/২০১০ এর রুল নং ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্য একাধিক পরীক্ষাগার তৈরী করবে। কিন্তু নিরীক্ষায় দেখা যায়

যে, অধিদপ্তর এক্ষেত্রে ল্যাবরেটরী স্থাপন ও প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্য এ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, অন্যদিকে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রমেরও অভাব রয়েছে।

কারণঃ খাদ্যে ফরমালিন এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণের কোন সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ না করা।

ফলাফলঃ গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণ না করায় আইনের যথাযথপ্রয়োগ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এতে করে খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

সুপারিশসমূহঃ বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে ফরমালিনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা ইস্যু-২ ঃ বর্তমানে প্রচলিত নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত আইন সমূহ কার্যকর ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা ?

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.১ ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের আমদানি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না।

বিবরণ ঃ খাদ্যে ফরমালিন ও কার্বাইডের ব্যবহার নিরাপদ খাদ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এই বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন মহলে আলোচিত হলেও ফরমালিন ও কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহার রোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

দীর্ঘদিন ফরমালিন আমদানি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ কোন আইন না থাকায় যে কেউ ইচ্ছে মতো ফরমালিন আমদানি করতে পারত এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবই খাদ্যে অবৈধভাবে এর ব্যবহারকে উৎসাহিত করেছে। এছাড়াও খাদ্যে ফরমালিনের ব্যবহার রোধে মন্ত্রণালয়ের কোন কার্যকর মনিটরিং এর ব্যবস্থা ছিল না।

১৯৫০ সালের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় ১৬ই মার্চ ২০১৩ সালে এসআরও ৭০-আইন/২০১৩ জারী করা হয়, যাতে নির্দেশনা দেয়া হয় যে, একজন আমদানিকারক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে ফরমালিন আমদানি করতে পারবেন এবং এই আমদানিকৃত ফরমালিনের বিক্রি ও এর ব্যবহার বিশদভাবে বর্ণনা করে রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে আমদানিকারকের ফরমালিন বিক্রির রেজিষ্টার যাচাই করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত এ ধরনের কোন এসআরও নেই।

কিন্তু এসআরও জারী হওয়ার পর, ফরমালিন/ফরমালডিহাইডের আমদানি উল্লেখযোগ্য ভাবে কমলেও প্যারাফরমালডিহাইড এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে ফরমালিন ব্যাপকভাবে আমদানি বেড়ে যায়। যার তিনটি উদাহরণ দেয়া হলো-

১. ২০১৩ সালে চট্টগ্রাম পোর্ট দিয়ে ১১মেঃ টন ফরমালিন/ফরমালডিহাইড আমদানি করা হয়েছিল। এসআরও জারীর পরে জুন ২০১৪ সালের মধ্যে মাত্র ১৯ কেজি ফরমালিন/ফরমালডিহাইড আমদানি করা হয়েছিল। যা ২০১৩ সালের আমদানিকৃত ফরমালিনের মাত্র ০.১৭%। জুন ২০১৪ সালের মধ্যে ফরমালিন/ ফরমালডিহাইড আমদানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলেও ফরমালিন/ফরমালডিহাইড এর অন্যান্য জেনেরিক ফরম যেমন- প্যারাফরমালডিহাইড প্যারাফরম, পলিক্সিমিথাইলিন, মরবিসিড এগুলো ব্যাপক পরিমাণে আমদানি হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে, বর্ণিত এসআরওতে এই নামগুলো অন্তর্ভূক্ত না থাকায়।

২. নীচের টেবিল এ লেখচিত্র-১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিসংখ্যানে একই রকম চিত্র পাওয়া যায়-

টেবিল ঃ ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালডিহাইড এবং প্যারাফরমালডিহাউড এর বছর ওয়ারী আমদানির পরিমাণ			
বৎসর	ক্যালসিয়াম কার্বাইড (কেজি)	ফরমালডিহাইড (কেজি)	প্যারাফরমালডিহাইড (কেজি)
২০১১-১২	২৫৬২৯০০	২০৫০৯৬	৭৮৩৩২৫০
২০১২-১৩	২০৯২৭০০	৫৫১৭৩	১০৪৫৭৫২৬
২০১৩-১৪	২০৪৯৬০০	১৯১১	১৩৫১০৬৫০

এতে বিগত তিন বছরে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের আমদানির পরিমাণ মোটামোটি স্থির থাকলেও, ফরমালডিহাইডের আমাদানির পরিমাণ রাতারাতি কমেছে। কিন্তু অন্যদিকে প্যারাফরমালডিহাইডের আমদানির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন।

লেখচিত্র-১

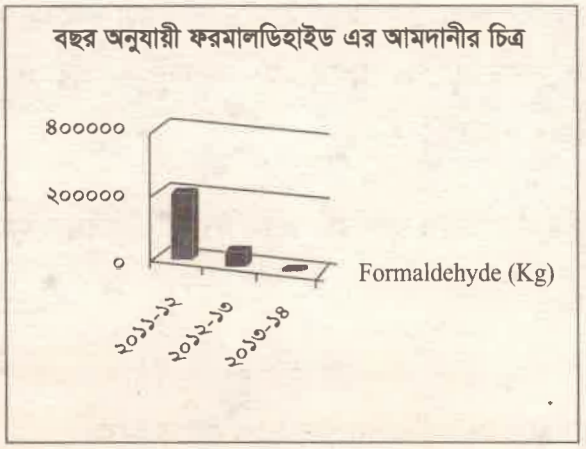

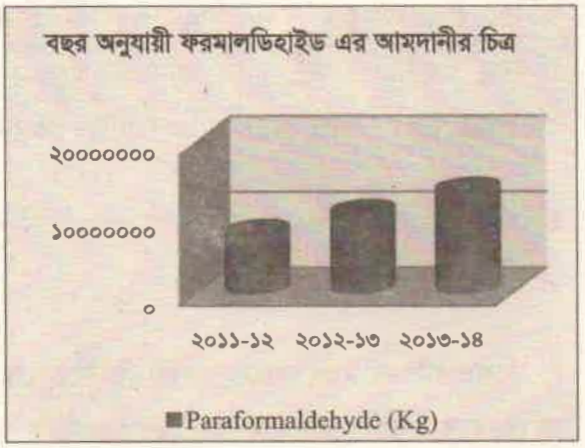

. ৩. নীচের টেবিল এ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানেও একই রকম চিত্র দেখা যায়

টেবিল : বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে ফরমালিন এবং ক্যালসিয়াল কার্বাইড এর আমদানির চিত্র				
বর্ণনা	মূল্য মিলিয়ন ডলার			উৎপত্তিস্থল
	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	
মিথানল/ফরমালিন (ফরমালডিহাইড)	০.২	০.০	০.১	ভারত, আমেরিকা, সৌদিআরব ও জার্মানী
প্যারাফরমালডিহাইড	৫.৮	৮.২	১০.৫	চীন, জার্মানী, হংকং, ভারত, আমেরিকা, স্পেন, তাইওয়ান, সৌদিআরব ও সিঙ্গাপুর।
কার্বাইড	২.২	১.৫	১.৪	চীন, হংকং ও ভারর্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যালস টেকনোলজী বিভাগের অধ্যাপক জনাব এবিএম ফারুক নিশ্চিত করেছেন যে, দেশে বর্তমানে ফরমালিন মূলত অন্য নামে আমদানি করা হচ্ছে। তিনি বলেন প্রায় ২৫ রকমের রাসায়নিককে সহজেই ফরমালিনে রূপান্তরিত করা যায়। এদের মধ্যে প্যারাফরমালডিহাইডই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমদানি করা হচ্ছে। প্যারাফরমালডিহাইডের সাথে ৩৭ ভাগ পানির মিশ্রনে তা সহজেই ফরমালিনে পরিণত হয়।

বর্তমান এসআরও অনুযায়ী ফরমালিন আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলেও ফরমালিন, ফরমালডিহাইড বা অন্যরূপে ব্যাপক হারে আমদানি হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে, ফরমালিনের আমদানি এবং এর সর্বত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য উল্লেখিত এসআরও, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়তা করতে পারছেনা। **আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ক্যালসিয়াম কার্বাইডের আমদানি ও এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য এরকম কোন এসআরও এখন পর্যন্ত প্রণয়ন করা হয়নি।**

অনিয়মের কারণঃ বর্তমান এসআরও অনুযায়ী ফরমালিন ব্যবহারের উপর যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা মূলত কার্যকর নয়। কেননা, ফরমালিন অন্য নামে আমদানি হচ্ছে। অন্যদিকে ফরমালিন ও কার্বাইডের আমদানি ও এর প্রান্তিক ব্যবহারের উপর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যকর কোনো মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ নেই।

ফলাফলঃ এর ফলশ্রুতিতে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড অদ্যাবধি অনিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই সাথে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বাড়ছে ।

সুপারিশঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে ফরমালিনের বিভিন্ন রূপে আমদানি বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.২ঃ মাঠ পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোর অভাবে ও বাজেট ঘাটতির কারণে বিদ্যামান আইনসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

বিবরণ ঃ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বাস্তবায়ন করার অন্যতম দায়িত্ব ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের। অধিদপ্তরটির বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি এবং জেলা পর্যায়ে ৬৪টি কার্যালয় রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজসমূহ হলো ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা; বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা (সারা দেশে গড়ে ১০-১২ টি বাজার প্রতি দিন) এবং জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

- **এসআরও নং ২৩৫/২০১০ এর রুল নং-৩** অনুযায়ী তাদের এক বা একাধিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা ও এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম থাকতে হবে। অন্যদিকে অধিদপ্তরটির সাংগঠনিক কাঠামোতে জেলা পর্যায়ে মাত্র একজন সহকারী পরিচালক এবং বিভাগীয় পর্যায়ে একজন উপ-পরিচালক ও দুই জন সহকারী পরিচালক কর্মরত রয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা যায়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে, এমনকি প্রধান কার্যালয়েও তাদের কোন গবেষণাগার ও গবেষণা কার্যক্রম নেই এবং বিভাগীয় কার্যালয় গুলিতে মাত্র একটি করে ডিজিটাল মিটার রয়েছে। আর প্রতিষ্ঠানটির মাঠ পর্যায়ে কারিগরি সক্ষমতা বলতে এটাই সম্বল। এছাড়াও একজন মাত্র কর্মকর্তা দিয়ে পুরো জেলা ও মাত্র ৩জন কর্মকর্তা দিয়ে পুরো বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করাও বেশ কঠিন।
- এছাড়াও বাজেট বরাদ্দও যথেষ্ট নয়। নীচের টেবিলে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন খাতে বাজেটের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬.১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ মাত্র ০.৯২ কোটি টাকা যা সমগ্র বাজেটের মাত্র শতকরা ১৫.০৮ ভাগ।

টেবিল ঃ ডিসিআরপির অনুন্নয়ন বাজেট			
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ডিসিআরপির সামগ্রিক অনুন্নয়ন বাজেট			৬.১০ কোটি
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের জন্য বাজেট বরাদ্দ (১৫.০৮%)			০.৯২ কোটি
কোড-৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	০.১৫ কোটি	
কোড-৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	০.১৫ কোটি	
কোড-৪৮৯০	প্রোগ্রাম ও কর্মকাণ্ড	০.২২ কোটি	
কোড-৪৮৯৯	বিবিধ	০.৪০ কোটি	

- নিরীক্ষায় আরও দেখা যায় ডিসিআরপি তাদের কার্যক্রমের ওপর **নিয়মিত কোন প্রতিবেদনও** প্রস্তুত করে না। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ১৭ ধারা অনুযায়ী ডিসিআরপি প্রতি বছর পূর্ববর্তী বৎসরের (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) কার্মকান্ডের ওপর প্রতিবেদন তৈরী করে তা সরকারের নিকট পেশ করবে মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য। কিন্তু ডিসিআরপি সৃষ্টির পর হতে এখন পর্যন্ত মাত্র দু'টি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম প্রতিবেদনটি ২৪ নভেম্বর ২০০৯ হতে ৩০ জুন ২০১০ সময়ের কার্যক্রম এবং দ্বিতীয় প্রতিবেদনে জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১ সময়ের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ মোতাবেক বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল গঠিত হবে এবং এর ৭ নং ধারা অনুযায়ী প্রতি ২ মাস পরপর এ কাউন্সিল এর সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। ২০১৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলের ১১ তম বার্ষিক সভায় বাণিজ্য মন্ত্রী পুনরায় এ ধারাটির বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সভার পর আট মাস অতিবাহিত হলেও এরপরে আর কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, আইন অনুযায়ী যে পরিমাণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিল তার অর্ধেকেরও কম সভার আয়োজন করেছে। নীচের টেবিল এ বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

টেবিল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিল কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভাসমূহ		
সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	মন্তব্য
১ম	৯ ডিসেম্বর ২০০৯	
২য়	১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০	
৩য়	১৫ জুন ২০১০	
৪র্থ	১৩ অক্টোবর ২০১০	২০১০ সালে ৬টি সভার পরিবর্তে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
৫ম	১৯ জানুয়ারী ২০১১	
৬ষ্ঠ	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১	২০১১ সালে ৬টি সভার পরিবর্তে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
৭ম	৩১ জানুয়ারী ২০১২	
৮ম	৭ নভেম্বর ২০১২	২০১২ সালে ৬টি সভার পরিবর্তে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
৯ম	৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩	
১০ ম	৭ জুলাই ২০১৩	২০১৩ সালে ৬টি সভার পরিবর্তে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
১১তম	১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৪	

অনিয়মের কারণঃ

- ডিসিআরপির সীমিত জনবল আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, দূর্বল মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় কমিটি সমূহ গঠিত না হওয়ার কারণে ভেজাল প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিধি ১০ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি এর গঠণ ও কার্যাবলী বিধি ১১ ও ১২তে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও এসআরও ২৪৭/২০১৩ অনুযায়ী উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠণ করতে হবে (রুল নং-৩) এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন ভোক্তা কমিটি গঠণ করতে হবে (রুল নং-৪)। এ কমিটি দু'টির কাজ হবে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মকান্ডের আয়োজন করা এবং এ সংক্রান্ত জেলা কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন, জেলা কমিটিকে বিভিন্ন কর্মকান্ডে সহায়তা করা (রুল নং-৫ ও ৬)। এ কমিটি দু'টিকে প্রতি মাসে অন্তত একটি মিটিং এর আয়োজন এবং বিধি অনুযায়ী তহবিলের ব্যবস্থাপনা করতে হবে (রুল নং-৭ ও ৮)। কিন্তু নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কমিটির সভা কখনই নিয়মিতভাবে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ২০১০ সালের ২৬শে এপ্রিল কমিটি গঠিত হওয়ার পর আর কখনই পটুয়াখালী জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।
    - বিভিন্ন কমিটির মধ্যে নিয়মিত কোন সমন্বয় মূলক কার্যক্রম নেই;
    - অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠিত হয়নি;
    - এছাড়া বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন প্রোগ্রাম, মিটিং এ অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি এসব কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের অনেকেরই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই।

ফলাফল ঃ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পর্কিত নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরী করা হয় না। এর ফলশ্রুতিতে মনিটরিং ও আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত হচ্ছে না। এমনকি ডিসিআরপি নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন না করায় মহান সংসদও এর কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে পারছে না। সেই সাথে ভেজাল প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হচ্ছে না।

সুপারিশ ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ডিসিআরপি'র জনবল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি প্রতিবছর এটির কার্যক্রমের মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত ও মনিটরিং জোরদার করণসহ প্রয়োজনীয় কমিটিসমূহ গঠন নিশ্চিত করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৩ ঃ বর্তমান আইনে ভোক্তার অভিযোগ করার প্রক্রিয়াটি সহজ নয় এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় ভোক্তাকেই বহন করতে হয়।

বিবরণ ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এসআরও নং ২৩৫/২০১০ এর বিধি-১২ অনুযায়ী ভোক্তাগণ ডিসিআরপি-এর নিকট ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া অথবা লিখিতভাবে অভিযোগ করতে পারবেন। অভিযোগ পাওয়ার পর মহাপরিচালক অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর বিধি ৬০ এবং ৭১ অনুসারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে একজন ভোক্তা কেইস করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে অধিদপ্তরকে ভোক্তার অভিযোগ সম্পর্কে একমত হতে হবে। আবার আইনটির বিধি ৬৩(৩)- এ বর্ণিত আছে যে, নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় ভোক্তাকেই বহন করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ভোক্তার সরাসরি অভিযোগ বিষয়ে মামলা করতে না পারা, অন্যদিকে নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় সমূহ ভোক্তাকেই বহন করতে হয় বিধায় এবং অভিযোগ প্রক্রিয়াকরণে নানাবিধ জটিলতার কারণে অনেক ভোক্তাই অভিযোগ করার বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

নীচের টেবিল এবং লেখচিত্র হতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার খুব কম সংখ্যক মানুষই এক্ষেত্রে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করেন।

টেবিল

বছর	অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা
২০১০	৭৩
২০১১	৫
২০১২	৬৯
২০১৩	৩২

লেখচিত্র

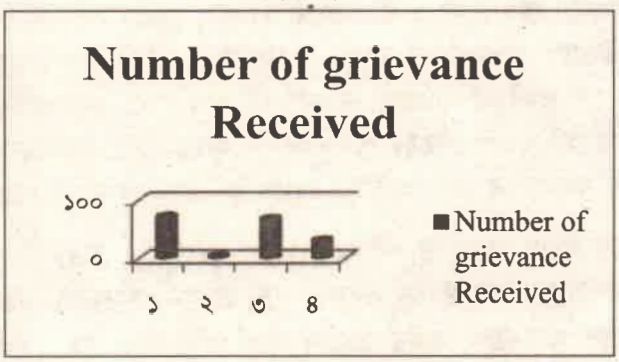

অনিয়মের কারণ ঃ অভিযোগ করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহের কারণ হলো অভিযোগ প্রক্রিয়ার জটিলতা এবং এ সংক্রান্ত ব্যয় ভোক্তাকেই বহন করতে হয়।

ফলাফলঃ ভেজাল প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত হচ্ছে এবং ডিসিআরপিও তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে না। ফলে খাদ্যে ভেজাল রোধে DCRP কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সুপারিশসমূহঃ ডিসিআরপির এক্ষেত্রে অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়াকে সহজতর করা এবং এ সংক্রান্ত কোন ফি না নেয়া অথবা এর ব্যয় ভোক্তাদের সাধ্যের মধ্যে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৪ ঃ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ খাদ্যে ভেজাল রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না।

বিবরণঃ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ সমগ্র দেশের ৩১৯টি পৌরসভা এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশনের খাদ্য পরিদর্শন এবং এ সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে খাদ্য পরিদর্শন ও আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম "ডি জি এইচ এস" এর মতই। এছাড়াও তারা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা প্রতিষ্ঠানসমূহ) অধ্যাদেশ ২০০৮ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশনসমূহ) অধ্যাদেশ ২০০৮ এর অধীন এ সংক্রান্ত সামান্য কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২০০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ অনুসারে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়কে এ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নোডাল মন্ত্রণালয়ের ভূমিকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে অধ্যাদেশের সংশোধনের মাধ্যমে এ দায় দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়। এই মন্ত্রণালয়কে ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কাউন্সিল এর সভাপতির দায়িত্বও দেয়া হয়। তবে গঠিত হওয়ার পর ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ৫ বছর পর ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০ সালে দ্বিতীয় সভা এবং ২২ আগষ্ট ২০১০ সালে ৩য় সভা অনুষ্ঠিত

হয়। এরপর কাউন্সিলের আর কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নি। নয় বছর যাবৎ সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে এই কাউন্সিল মাত্র ৩টি সভার আয়োজন করেছিল এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

পৌরসভার ও সিটি কর্পোরেশনের আয়তন, জনসংখ্যার আধিক্য এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রেড অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে অধিকাংশ পৌরসভাতেই স্বাস্থ্য বিভাগীয় পরিদর্শকের পদটি শূন্য রয়েছে। নিরীক্ষা অনুসন্ধানে দেখা যায়, স্বাস্থ্য বিভাগীয় পরিদর্শকগণ নিম্নোক্ত কারণে তাদের দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে পারছেন না ঃ

জনবলের স্বল্পতা ঃ ৩১৯টি পৌরসভা এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৩৭০টি তবে এর বিপরীতে বর্তমানে মাত্র ৭৮ জন কর্মরত আছেন অর্থাৎ ৭৯% পদই শূন্য রয়েছে।

প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকস্ ও পরিকল্পনার অভাব ঃ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শকদের কোন নির্দিষ্টভাবে পরিদর্শনের লক্ষ্য, এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং এ সংক্রান্ত কোন ম্যানুয়াল নেই। এছাড়াও নমুনায়ন পদ্ধতির দূর্বলতা, নমুনা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব রয়েছে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিদর্শকগণ মূলত হোটেলে অথবা রেষ্টুরেন্টে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। খাদ্যে ফরমালিন এবং কার্বাইড রোধে খুব কমই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা পদ্ধতির দূর্বলতা ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মত স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শকগণও খাদ্যের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিরাপদ অর্ডিন্যান্স আইন ১৯৬৭ দ্বারা পরিচালিত হয়। এক্ষত্রে সংগৃহীত খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য সাধারণত ঢাকার ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ্ এর ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয় (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত)। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ল্যাবরেটরী রয়েছে এবং কর্পোরেশন তার আওতাভূক্ত এলাকায় খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে তার ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে থাকে। তবে এর প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। তাই সংগৃহীত অনেক নমুনাই পরীক্ষার জন্য ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ্ এর ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়। আবার ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ্ গবেষনাগারের সেবার মানও সন্তোষজনক নয়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। যার একটি উদাহরণ *(নিরীক্ষা পর্যক্ষেণ -৩.১) এ উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যায় নমুনা প্রেরণ থেকে ফলাফল পেতে ১০ থেকে ১১ মাস সময় লেগেছে।*

যথাযথ রিপোর্টিং ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ নীতি না থাকা ও এ সংক্রান্ত আইনগত সহায়তা প্রদানে শক্তিশালী অবকাঠামোরও অভাব রয়েছে ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডের মনিটরিং, তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন প্রদানের ব্যবস্থা বেশ দূর্বল। পরিদর্শকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণ নীতিমালাও নেই এবং প্রতিষ্ঠানটিতে যথেষ্ট সংখ্যক আইন কর্মকর্তা না থাকায় এসংক্রান্ত বিভিন্ন কেইসের দ্রুত নিষ্পত্তি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব না হওয়ায় আইনের কার্যকর প্রয়োগ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

অনিয়মের কারণঃ অনেক শূন্য পদ, পরিকল্পনার অভাব ও অপর্যাপ্ত লজিষ্টিক সাপোর্ট, খাদ্য নমুনায়ন ও পরীক্ষণের দূর্বলতা এবং যথাযথ ফিডব্যাক ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি কারণে পরিদর্শকগণ তাদের আশানুরূপ সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

ফলাফলঃ বিভিন্ন বাজার যথাযথভাবে মনিটরিং না করায় ফলে খাদ্যে ফরমালিন ও কার্বাইড এর ব্যবহার রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সুপারিশঃ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের জরুরী ভিত্তিতে শূন্যপদসমূহ পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি পরিদর্শকদের পেশার উন্নয়ন ও প্রমোশনের সুযোগ সৃষ্টি করাসহ, এ সংক্রান্ত কাজের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়াও নমুনার যথাযথ পরিবহণের ব্যবস্থাসহ উন্নততর নমুনায়ন ও পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা, এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরী এবং শক্তিশালী আইনগত অবকাঠামো গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৫ ঃ অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়কৃত মাছের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মৎস্য পরিদর্শকদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তার অভাব রয়েছে।

বিবরণঃ মৎস্য অধিদপ্তর তার তিনটি উইং এর মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উইং তিনটি হলো- (১) মৎস্য সম্প্রসারণ উইং ঃ রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য অভ্যন্তরীণ ভাবে উৎপাদিত মৎস্য, (২) মেরিন ফিসারিজ উইং ঃ সামুদ্রিক মাছ (৩) মৎস্য পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণ উইং ঃ রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এ অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ প্রায় ৫৩০ জন পরিদর্শক কর্মরত, যারা বর্ণিত আইন কানুন সমূহের বাস্তবায়ন করে থাকে। যেমন-মেরিন ফিশারীজ অধ্যাদেশ ১৯৮৩, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধি (সংশোধিত) ২০০৮ এবং মৎস্য ও প্রাণী খাদ্য বিধি ২০০৯।

মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ উইং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন মাইক্রোবায়াল স্পেসিফিকেশন অব ফুড (ICMSF) অনুসরণ করে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে থাকে। অন্য উইং গুলো কোন ধরনের পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুসরণ না করে নমুনা সংগ্রহ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ সংশ্লিষ্ট উইংটি ন্যাশনাল রেসিডিউ মনিটরিং প্লান এর আওতায় নমুনা সংগ্রহ করে এবং এর মূল্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও রপ্তানিযোগ্য মাছের মান নিয়ন্ত্রণ এর ক্ষেত্রে একটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পও কাজ করছে, সংগৃহিত নমুনাসমূহ তাপ নিরোধক পাত্রে সংরক্ষণ করে ঢাকার BCSIR ল্যাবরেটরী, মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী এবং গাজীপুরের বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্স ইনষ্টিটিউট (BARI) গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। নমুনাসমূহ সরাসরি ব্যক্তির মাধ্যমে ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়। অথচ অভ্যন্তরীণ বাজারের মাছের মান নিশ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জেলায় পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাত্র ১টি করে ডিজিটাল মেশিন দেয়া হয়েছে। সমগ্র জেলার কার্যক্রম একটি মাত্র ডিজিটাল মেশিন দ্বারা পরিচালনা করা একেবারেই অসম্ভব।

অনিয়মের কারণ ঃ প্রযুক্তিগত অপর্যাপ্ততা।

ফলাফলঃ অভ্যন্তরীণ বাজারের মাছের ফরমালিন দূষণের ঝুঁকিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। ফলে মাছে ফরমালিন ব্যবহারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুপারিশঃ এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরকে অভ্যন্তরীণ বাজারের মাছের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৬ ঃ আমদানিকৃত খাদ্য পণ্যে ফরমালিন ও অন্যান্য দূষণকারী পদার্থের সনাক্ত করণে স্থল বন্দরসমূহে নিয়োজিত শুল্ক বিভাগের পরিদর্শকদের পরিচালিত সনাক্তকরণ কর্ম পদ্ধতি অপর্যাপ্ত ও অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বিবরণঃ বাংলাদেশ উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় প্রকার দেশ হতে খাদ্য ও কৃষিজাত পন্য আমদানি করে থাকে। আমদানিকৃত খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য দেশের ৩টি বিমান বন্দর, ২টি সমুদ্র বন্দর এবং ১৪টি স্থল বন্দর দিয়ে প্রবেশ করে থাকে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে মোট আমদানির ৮০% এর বেশি খাদ্য দ্রব্য দেশে প্রবেশ করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন শুল্ক বিভাগ বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিত ভাবে এসব আমদানিকৃত খাদ্য দ্রব্য পরিদর্শনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে যে আইন, নিয়ম কানুনসমূহ অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা হলো-

আমদানি নীতি আদেশ (আইপিও) ২০০৯-২০১২, আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রন) আইন ১৯৫০, এছাড়াও বেশ কিছু সাবসিডিয়ারি আইন, বিধি, রেগুলেশন এবং ষ্ট্যান্ডার্ড রয়েছে।

টেকনাফ ও বেনাপোল স্থল বন্দরে নিরীক্ষাকালে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ লক্ষ্য করা যায়-

- ফরমালিন কিটস্ অথবা ডিজিটাল মিটার দিয়ে মাছে ফরমালিন এবং ফরমালডিহাইড এর অস্তিত্ব আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়।
- এক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন অনুমোদিত পরিকল্পনা বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। শুধুমাত্র সন্দেহ ও ব্যক্তিগত অবজারভেশনের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।
- নমুনাসমূহ বন্দর থেকে বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে প্রেরণেও কোন আনুষ্ঠানিক পরিবহন ব্যবস্থা নেই এবং নমুনা সংরক্ষণের জন্য শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও নেই। সংগৃহীত নমুনাসমূহ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে ডাকযোগে, বেসরকারী কুরিয়ার সার্ভিস অথবা ব্যক্তিগতভাবে বিএসটিআই, আইপিএইচ ল্যাবরেটরী অথবা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়।
- এক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহ ও সংগৃহীত নমুনা বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো, পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ ও ফলাফল প্রতিবেদন উপস্থাপন এসব কার্যক্রম আমদানিকারকের প্রতিনিধি করে থাকে।
- স্থল বন্দর দু'টোর ল্যাবরেটরীর খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। পরীক্ষাগারগুলোতে ফলমূল ও শাকসবজিতে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরীক্ষার সুযোগ নেই।

অনিয়মের কারণঃ বন্দরসমূহে খাদ্যে ভেজাল সনাক্তকরণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা গড়ে না ওঠা এবং পরিদর্শকদেরও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেই।

ফলাফলঃ আমাদনিকৃত খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর অস্তিত্ব সনাক্তকরণে বন্দরসমূহ যথেষ্ট সক্ষম নয়। ফলে ভেজাল খাদ্য আমদানির ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে।

সুপারিশঃ শুল্ক বিভাগের এক্ষেত্রে যথাযথ এবং কার্যকর নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। বন্দরের পরীক্ষাগারগুলোতে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা; অনুমোদিত নমুনায়ন পরিকল্পনা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা, নমুনাসমূহ ল্যাবরেটরীতে প্রেরণের জন্য যথাযথ পরিবহনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নমুনা সংগ্রহ, ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ এবং ফলাফল সংগ্রহ করার দায়িত্ব শুল্ক বিভাগকেই নিশ্চিত করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৭ ঃ খাদ্যের পরীক্ষার জন্য "পাবলিক এ্যানালিষ্ট অব ফুড" নিয়োগ দেয়া হয়নি এবং "খাদ্য আদালতও" কার্যকরী হয়নি।

বিবরণঃ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫) এর বিধি ৪ (১) অনুসারে, প্রত্যেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার আওতাধীন এলাকায় এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এক বা একাধিক "পাবলিক এ্যানালিষ্ট অব ফুড" নিয়োগ দিতে পারবেন। সেকশন ৩ (৭) (সি) অনুসারে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের আওতাধীন এলাকা ব্যতিত সরকার এক বা একাধিক ব্যক্তিকে "পাবলিক এ্যানালিষ্ট অব ফুড" নিয়োগ দিতে পারেন। এছাড়াও সাব সেকশন ১ (ক) অনুযায়ী সরকার তার নির্দিষ্টকৃত স্থানীয় এলাকার বাইরেও এক বা একাধিক "পাবলিক এ্যানালিষ্ট অব ফুড"নিয়োগ দিতে পারেন। খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ এর ৪৫ নং বিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য ও খাদ্য উপকরণের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের জন্য "পাবলিক এ্যানালিষ্ট অব ফুড" নিয়োগ দিবেন।

বিশুদ্ধ নিরাপদ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর বিধি ৪১ (১) অনুযায়ী সরকার চাইলে প্রতিটি জেলায় এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা করবে এবং উল্লিখিত খাদ্য আদালত একজন কর্মকর্তাকে নিয়ে গঠন করা হবে যিনি হবেন একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট এবং এ আইনের অধীন যে কোন দন্ডাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা তার থাকবে। বিধি ৪১ (৩) অনুযায়ী সরকার এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আদালতের এলাকা সুনির্দিষ্ট করে দেবে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর বিধি ৬৪ অনুযায়ী সরকার জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা করবে। এ আইনের লক্ষ্য পূরণের জন্যে এ আদালতকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত অথবা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, যেমন মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত খাদ্য আদালত হিসেবে বিবেচিত হবে। একাধিক আদালত গঠণ করা হলে এক্ষেত্রে আদালতের এলাকা নির্ধারণের পাশাপাশি, এ আদালতের বর্ণিত আইনে যে কোন দণ্ডাদেশ দেয়ার ক্ষমতা থাকবে।

২০০৯ সালের ১৪ই জুলাই, রিট পিটিশন নং-১১৯০/২০০৯ এর ওপর প্রদত্ত রায়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষকে আগামী দু'বছরের মধ্যে প্রত্যেক জেলা ও সিটি কর্পোরেশনে একজন "পাবলিক এ্যানালিষ্ট অব ফুড" নিয়োগ এবং প্রত্যেক জেলায় একটি করে "খাদ্য আদালত" প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তবে অদ্যাবধি এ রায়ের কার্যকর বাস্তবায়ন হয়নি।

এছাড়াও ২০০৯ সালের ১৮ই মার্চের **এসআরওনং ৭৩/আইন/২০১৩ অনুযায়ী** আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রত্যেক জেলা ও চারটি মেট্রোপলিটন শহরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠার ও "পাবলিক এ্যানালিষ্ট অব ফুড" নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেও, নিরীক্ষাকালীন সময়ে এর কোন কার্যকর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি।

অনিয়মের কারণ ঃ সম্পদের সীমাবদ্ধতা, এ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও রায়ের বাস্তবায়নে আন্তরিকতার অভাব।

ফলাফলঃ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনের কার্যকর প্রয়োগ দূর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে খাদ্য ভেজালরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সুপারিশঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়কে ফুড এ্যানালিষ্ট নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৮ ঃ প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (কোল্ড চেইন) অবকাঠামো গড়ে না ওঠায় এটি মূলত খাদ্যে ফরমালিন এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর ব্যবহারকে উৎসাহিত করছে।

বিবরণঃ উন্নত দেশগুলোতে শস্য উৎপাদন স্থান থেকে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করা পর্যন্ত শস্য সংগ্রহ ও বিপণন পর্যায়ে কার্যকর কোল্ড চেইন এর অবকাঠামো রয়েছে। ফসল কাটার পর তা সতেজ রাখা ও ভালভাবে সংরক্ষণ করার সবচাইতে ভাল উপায় হলো এগুলোকে নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা, যেমন-কোন কোন ক্ষেত্রে ০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নীচে অথবা ০"ডিগ্রী "সেলসিয়াস এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা। যেমন, মৎস্যজাত পণ্য, কিছু কিছু ফলমূল এবং শাকসবজি ঠান্ডা তাপমাত্রায় কয়েকমাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

দ্রুত পচনশীল খাদ্য দ্রব্য যেমন-মাছ, মাংস, কিছু শাকসবজি, এগুলো অতি নিম্ন তাপমাত্রায় হিমায়িত করে রাখা পৃথিবী ব্যাপী একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এতে করে খাদ্য দীর্ঘদিন সতেজ থাকে। খাদ্য দ্রব্য দীর্ঘ দিন সতেজ রাখার আরেকটি অন্যতম জনপ্রিয় উপায় হলো এগুলোকে শুষ্কভাবে সংরক্ষণ করা। অন্য একটি পদ্ধতি হলো ক্যানিং। এটি এমন একটি পদ্ধতি যা প্রায় ২০০ বছর ধরে প্রচলিত আছে।

ব্রাজিল, ফিলিপাইন এবং ক্যারিবীয় দেশসমূহ উচ্চ পচনশীল ফল যেমন-কলা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করছে। কিন্তু বাংলাদেশে, এ ছোট ভূখন্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কোন বিষাক্ত প্রিজারবেটিভ প্রয়োগ ছাড়া ফল সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। আমেরিকা, কানাডা, ব্রাজিল, চীন, অষ্ট্রেলিয়ার মত বৃহৎ দেশগুলো মাছ, মাংস, ফলমূল, শাকসবজি এবং অন্য যেসব খাদ্য দ্রব্য যেগুলো উচ্চমাত্রার পচনশীল তাতে কোন প্রকার বিষাক্ত প্রিজারভেটিভ না দিয়েই দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, অনেক ক্ষেত্রে কয়েক হাজার মাইল দূরেও পাঠাচ্ছে। এটি সম্ভব হয়েছে. ঐ সব দেশে পণ্য পরিবহণে কোল্ড চেইন স্থাপনের মাধ্যমে অর্থাৎ হিমাগার থেকে হিমাগার সমৃদ্ধ ট্রাক ও ট্রেনে বা অন্যান্য যানবাহনে পরিবহণ করা হয় এবং এর ফলে খাদ্য দ্রব্যকে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন থেকে রক্ষা করে সতেজ রাখা সম্ভবপর হয়।

এক্ষেত্রে চীন "রোল মডেল" হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ২০১০ সালে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চীন তার ২৭টি প্রদেশের ২৬১টি কাউন্টিতে, স্বায়ত্বশাষিত অঞ্চলগুলোতে, মিউনিসিপালিটি এলাকার গ্রামীণ বাজারগুলোতে কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য কয়েকশত কোল্ড ষ্টোরেজ গড়ে তুলেছে।

কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি অন্যরকম, বাংলাদেশ কোল্ড ষ্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশনের মতে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এর অধীন ২২টি কোল্ড ষ্টোরেজ রয়েছে যা মূলত আলু ও অন্যান্য সবজীর বীজ সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে বেসরকারী পর্যায়ে ৪০৮টি কোল্ড ষ্টোরেজ রয়েছে। যার মধ্যে চলতি বছরে (২০১৫) প্রায় ২৪টি চলতি মূলধনের স্বল্পতা, ঋণের বোঝা, ঋণের সুদ এবং বিদ্যুৎ এর মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বন্ধ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমানে এ ধরণের পর্যাপ্ত কোল্ড চেইন অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। ফলমূল ও শাকসবজি তোলার পর সাধারণ যানবাহনে করেই তা বাজারে প্রেরণ করা হয়। এগুলো পরিবহণে কখনও কখনও কয়েকদিন সময় লেগে যায়। এর ফলে কাঁচা ফলমূল ও কিছু সবুজ শাকসবজি ছাড়া পাকা ফলমূল পরিবহণের সময় পঁচে গিয়ে বিক্রির অযোগ্য হয়ে পড়ে । তাই পঁচে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা এসব সবুজ শাকসবজি ও অন্যান্য পচনশীল খাদ্য দ্রব্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে থাকে।

আবার যখন কাঁচা ফলমূলগুলোতে বাজারে এসে পৌছায়, তখন ব্যবসায়ীরা আবার বিভিন্ন "রাইপেনিং এজেন্ট" ব্যবহার করে দ্রুত ফলগুলোকে পাকানোর ব্যবস্থা করে বিক্রয়ের জন্য।

আমের ওপর ফরমালিন ছিটানো হচ্ছে, যাতে করে বেশি দিন সতেজ থাকে এবং সহজে পচে না যায়। ছবিটি মেহেরপুরে তোলা।

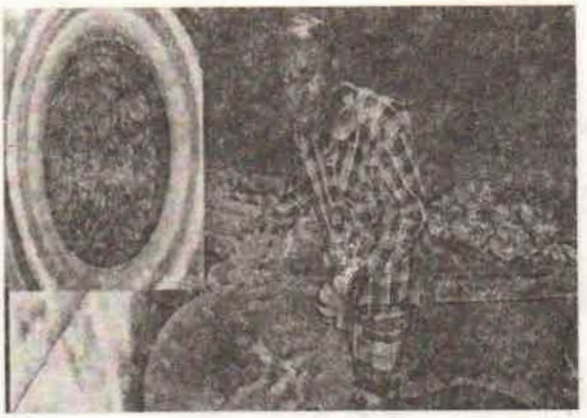

কলার সাথে কার্বাইড ব্যবহার করে মাটির পাত্রে রাখা হচ্ছে, যাতে করে তাপে তা পেঁকে যায়।

অনিয়মের কারণ ঃ খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষনের জন্য "কোল্ড চেইন" এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট বিনিয়োগ না করা এর একটি অন্যতম কারণ।

ফলাফলঃ হিমাগার সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণ না থাকায় কৃষকেরা ফলমূল, শাক সবজিতে ফরমালিন ও এ জাতীয় অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে থাকে।

সুপারিশঃ খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষনের জন্য "কোল্ড চেইন" এর অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার ও আমদানি/ রপ্তানিকারকদের বিনিয়োগ বাড়াতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ২.৯ ঃ দূর্বল মনিটরিং, সমন্বয়ের অভাব, যথেষ্ট পরিমাণ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম না থাকা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয়া, খাদ্যে ফরমালিন ও কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহারকে উৎসাহিত করছে।

বিবরণঃ নিরাপদ খাদ্য আইনের ১৩(১) বিধি অনুসারে, "ফুড সেফটি অথরিটির" অন্যতম কাজ ও কর্তব্য হলো, খাদ্যের উৎপাদন, আমদানি ও প্রক্রিয়াকরণ, মজুদকরণ, বন্টন এবং সর্বোপরি বিক্রয় পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা এবং এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং ও রেগুলেইট করা।

আবার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিধি ৮ (এইচ) এ বলা হয়েছে-কাউন্সিলের একটি কাজ হলো ডিসিআরপি'র এবং অন্যান্য কমিটির কার্যক্রম মনিটরিং করা। এছাড়াও খাদ্যে ভেজালের বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহও মনিটরিং করে থাকে।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, খাদ্যে ভেজালের ব্যাপারে ভোক্তারা এখন অনেক বেশী সচেতন থাকলেও তা খাদ্যে ভেজাল রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গুলো ঠিকমত কাজ না করায়, খাদ্যে ভেজাল বিরোধী কার্যক্রমে জনগণকে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এবং এক্ষেত্রে সরকার ও এনজিওদের মধ্যেও কার্যকর সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

অকার্যকর এবং বৈপরীত্য মনিটরিং এর একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

জনাব শাইখ সিরাজ, (প্রখ্যাত কৃষিবিদ) এর মতে, আমদানিকৃত ফল, বিশেষ করে ব্রাজিল ও চিলি থেকে আমদানিকৃত আপেল এ উচ্চ মাত্রার প্রিজারভেটিভ দেয়া হয়। আমদানিকারকদের মতে, এ ফল আমদানি মনিটরিং করা হয় এবং দুবার প্রত্যয়ন নিতে হয়, প্রথমটি রপ্তানিকারকের দেশ হতে "কান্ট্রি অব অরিজিন" এবং দ্বিতীয়টি এদেশের আমদানি বন্দর থেকে। ব্রাজিল থেকে জাহাজে ফল আসতে প্রায় ৪০ দিন এবং চিলি থেকে আসতে ৫৫ দিন লেগে যায়। ফলগুলোকে কন্টেইনারে (০-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) সংরক্ষণ করা হয় যাতে করে যাত্রাপথে ফলগুলো সতেজ থাকে। কিন্তু চট্টগ্রাম বা অন্যান্য বন্দর থেকে যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে ফল প্রেরণ করা হয়, তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিহীন সাধারণ পরিবহণে প্রেরণ করা হয়, বিক্রয় পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়, এতে করে ফলগুলো তখন পর্যন্ত কিভাবে সতেজ থাকে? যা এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই খুজে দেখা উচিত।

কিন্তু বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায় , যখন এদেশের কৃষকেরা বা রপ্তানিকারকেরা আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি অনুসরণ করেই তরিতরকারী ইউরোপসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে রপ্তানী করে থাকে। এ ক্ষেত্রে জড়িত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য কীটনাশক ব্যবহার করে অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ নিশ্চিত করে থাকে। অথচ আমদানির ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্যনীয়।

নিম্নের চিত্রটি বলে দিচ্ছে সত্য। একজন কৃষক সদ্যক্ষেত থেকে তোলা সবুজ টমেটোতে সকাল বেলা রাইপেনিং এজেন্ট রাসায়নিক পদার্থ স্প্রে করছে, ফলে একই দিনের বিকেল বেলা টমেটো পেকে যাওয়ার পর বাজারজাতকরণের জন্য ঝুড়িতে তোলা হচ্ছে।

ছবিটি মুন্সিগঞ্জের চর কিশোরগঞ্জ থেকে তোলা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুসারে যথাযথ কর্তপক্ষকে, জনগনকে নিম্নোক্ত বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে-

বিষয়গুলো হলোঃ-

ক) ভোক্তা অধিকার খ) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং গ) ভোক্তার অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ায় সম্পর্কিত কার্যাবলীর ফলাফল। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর বিধি ১৩ (এম) অনুযায়ী বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটির" অন্যতম একটি কাজ হলো নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য মান সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরী করা।

বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এ কালো বাজারী ও খাদ্যে ভেজালের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। এ আইনের সেকশন-২৫ এ উল্লেখ আছে কেউ যদি কালোবাজারীর উদ্দেশ্যে পণ্য মজুদ ও লেনদেন করে, এবং তা প্রমাণিত হলে তাকে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, অথবা ১৪ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং সেই সাথে জরিমানাও করা যেতে পারে।

অন্যদিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কেউ যদি মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভোক্তাকে প্রতারিত করে, তবে সে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অথরিটি দায়ী ব্যক্তিকে জরিমানা সহ (৫০,০০০-২ লক্ষ টাকা) ১ থেকে ৩ বছরের জেল প্রদান করতে পারে। এ সকল কঠোর শাস্তির প্রবিধান থাকলেও নিরীক্ষায় দেখা যায় এ ধরনের অপরাধের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূন্যতম শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। যার কয়েকটি উদাহরণ পরিশিষ্ট-৪ এ বর্ণনা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৫৩)।

এমনকি যে সব বাজারগুলো মার্কেট কমিটি কর্তৃক ফরমালিনমুক্ত বাজার ঘোষিত হয়েছে পরবর্তীতে ঐসব বাজারগুলোতে ফরমালিন সনাক্ত হয়েছে, সে বাজারগুলোর কমিটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ ঃ পুরো খাদ্য চেইনকে মনিটরিং এর আওতায় না আনা, বিভিন্ন দপ্তর এর মধ্যে সমন্বয় না থাকা, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটিগুলো কার্যকর ভূমিকা না রাখা, ভেজাল বিরোধি কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারা এবং সর্বোপরি এ অনৈতিক কাজের সাথে জড়িতদের খুব সামান্য সাজা অথবা সাজা প্রদান না করা।

ফলাফলঃ মনিটরিং দূর্বলতা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ না করায় খাদ্যে ভেজাল দেয়ার কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুপারিশ ঃ পুরো খাদ্য চেইনকে মনিটরিং এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের কার্যক্রমকে আরও সুসংহত ও কার্যকরী করতে হবে, ভেজাল বিরোধী কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং ভেজাল মিশ্রনকারিকে আইনের মাধ্যমে যথাযথ সাজা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

নিরীক্ষা ইস্যু-৩ ঃ ফরমালিন ও কার্বাইড সনাক্তকরণে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আছে কিনা ?

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.১ঃ সব ধরণের খাদ্যের ভেজাল পরীক্ষণের জন্য সব গবেষণাগারের একই ধরণের সক্ষমতা নেই এবং এ সংক্রান্ত পরীক্ষা কার্যক্রমও ব্যয়বহুল। এছাড়াও গবেষণাগারগুলো খাদ্যদ্রব্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর ভেজাল সনাক্ত করতে সক্ষম্ নয়।

বিবরণঃ তিনটি প্রধান গবেষণাগার-বিএসটিআই, আইপিএইচ, বিসিএসআইআর কোনটিই সব ধরণের খাদ্য দ্রব্য পরীক্ষা করে না এবং পরীক্ষার সক্ষমতাও একই ধরণের নয়। শুধুমাত্র তাদের কাছে যে সকল খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি আছে শুধু সেগুলোই পরীক্ষা করে থাকে। আবার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল সনাক্ত করণের জন্য বিএসটিআই, আইপিএইচ, বিসিএসআইআর, সিভিল সার্জন কার্যালয়, এবং সিটি কর্পোরেশন ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তি/যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ-

- **বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন (বিএসটিআই)** ফলমূল এবং শাকসবজিতে শুধুমাত্র ফরমালিন এর অস্তিত্ব পরীক্ষা করে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন দিয়ে থাকে। যদিও এ প্রতিষ্ঠানের আরও ব্যাপকভাবে খাদ্য বিশ্লেষণের সক্ষমতা আছে। কেননা, প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে, দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত রসায়নবিদ, বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি এবং খাদ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ভিত্তি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র খাদ্যে ফরমালিন আছে কি নেই অর্থাৎ অস্তিত্ব পরীক্ষণ করে থাকে এবং প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য ৫০০ টাকা চার্জ করে থাকে । প্রতিষ্ঠানটি খাদ্যে কি পরিমাণ ফরমালিন আছে সে ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করে না কিংবা এ সংক্রান্ত কোন বিশ্লেষণ কার্যক্রমও গ্রহণ করে না।

- **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন (বিসিএসআইআর)** শুধুমাত্র মাছ ও তরল পদার্থ যেমন- দুধ, ফলের জুস ইত্যাদির ফরমালিন অস্তিত্ব ও এর মাত্রা নির্ণয় করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ফরমালিন এর অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্য ৫০০ টাকা এবং মাত্রা পরীক্ষার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ৬৫০০ টাকা নিয়ে থাকে।

- **ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গাইজেশন এর সহযোগিতায় স্থাপিত আধুনিক গবেষণাগারে** ফরমালিন সনাক্তকরণ ও এর বিশ্লেষণের সুবিধা রয়েছে। তবে প্রতিটি পরীক্ষার জন্য মূল্য নিয়ে থাকে ৬০০০ টাকা।

- অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট এর নিয়মিত গবেষণাগারে কোন নমুনা পরীক্ষার জন্য অনেক সময় লেগে যায় এবং এর দক্ষ জনবলও নেই। এ সংক্রান্ত একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো-

আইপিএইচ এর নিয়মিত ল্যাবরেটরী কর্তৃক পরীক্ষার ফলাফল প্রেরণের জন্য গৃহীত সময়			
সূত্র পটুয়াখালী পৌরসভা	পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নমুনা প্রেরণ	ফলাফল প্রাপ্তি	অতিক্রান্ত সময়
নমুনা নম্বর ঃ ৪৬৩০	২৯ জুলাই ২০১৩	২৯ মে ২০১৪	১০ মাস
নমুনা নম্বর ঃ ৪৫৪৯	৩০ জুন ২০১৩	২৯ মে ২০১৪	১১ মাস
নমুনা নম্বর ঃ ৪৫৪৫,৪৫৪৬, ৪৫৪৭, ৪৫৪৮	৩০ জুন ২০১৩	২৯ মে ২০১৪	১১ মাস

- এছাড়াও ঢাকার উভয় সিটি কর্পোরেশনের (ডিসিসি) গবেষণাগারে খাদ্য পরীক্ষার জন্য খুবই সীমিত সুযোগ সুবিধা রয়েছে; এর জনবল সীমিত এবং বিশেষায়িত যন্ত্রপাতিরও অভাব রয়েছে। খাদ্যে ফরমালিন এবং কার্বাইডের সনাক্তকরণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং পটুয়াখালী ও শ্রীমঙ্গল পৌরসভায় কোন প্রকার গবেষণাগার ও প্রযুক্তি নেই। তবে চট্টগ্রামে সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে একটি আধুনিক গবেষণাগার স্থাপনের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে নিরীক্ষাদলকে অবহিত করা হয়েছে।

- উল্লেখ্য যে, কোন গবেষণাগারই ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ভেজাল নির্ণয় করতে সক্ষম নয় আবার বিভিন্ন গবেষণাগারগুলোর সক্ষমতারও ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ বর্তমানে কোন গবেষণাগারই খাদ্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড সনাক্তকরণে সক্ষম নয়। বাজেট স্বল্পতার কারণে গবেষণামূলক কাজের জন্য প্রণোদনার অভাব;

- ধারাবাহিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্ম পরিকল্পনার অভাব;
- ভোক্তাদেরও সবকিছু মেনে নেয়ার প্রবণতা;
- পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ও অধিক।

ফলাফলঃ খাদ্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। পরীক্ষার উচ্চ ব্যয় ও পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তির দীর্ঘ সূত্রিতা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের অন্যতম প্রতিবন্ধক। এতে করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং খাদ্যে ভেজাল দেয়ার অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুপারিশসমূহঃ এক্ষেত্রে গবেষণাগারগুলোকে খাদ্যে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সনাক্তকরণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন অথবা প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আমদানী করতে হবে;

- গবেষণার কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা/নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.২ ঃ একই নমুনার ওপর বিভিন্ন গবেষনাগার কর্তৃক সম্পাদিত ফরমালিন সনাক্তকরণ পরীক্ষার ফলাফলে ভিন্নতা পাওয়া গিয়েছে।

বিবরণঃ নিরীক্ষা দল ১৫ই সেপ্টেম্বর ও ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ কিছু মাছ, তরল পদার্থ ও ফলমূল সংগ্রহ করে এতে ফরমালিনের মাত্রা পরিমাপের জন্য বিসিএসআইআর, বিএসটিআই এবং ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এর এফএও স্থাপিত আধুনিক গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে। নীচের টেবিলে একই নমুনার ওপর বিভিন্ন গবেষণাগার থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের একটি তুলনামুলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো-

নিরীক্ষাদল কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা সমূহের ফরমালিনের সনাক্তকরণ পরীক্ষার ফলাফল				
	প্রদত্ত ফলাফলসমূহ			
যে সকল নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং যে স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।	বিএসটিআই কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফল	এফএও/আইপিএইচ/ (এনএফএসএল) প্রদত্ত ফলাফল	এফএও/আইপিএইচ/ (এনএফএসএল) নভেম্বর ২০১৩ তার নিজস্ব উদ্যোগে কিছু নমুনা পরীক্ষার ফলাফল	বিসিএসআইআর প্রদত্ত ফলাফল
মাল্টা (শান্তিনগর বাজার)	ফরমালিনের মাত্রা -০	ফরমালিনের মাত্রা : ১.৭৫+০.১৪	-	-
আঙ্গুর (গুলিস্তান)	ফরমালিনের মাত্রা -০	ফরমালিনের মাত্রা : ১.৬২+০.০৪		-
আম (আশ্বিনি) (গুলিস্তান)	ফরমালিনের মাত্রা -০	ফরমালিনের মাত্রা : ৩.০৮+০.০৯		-
আম (চোষা) (গুলিস্তান)	ফরমালিনের মাত্রা -০	ফরমালিনের মাত্রা : ৩.০৮+০.০৯		-
আপেল (শান্তিনগর বাজার, আগোরা) চেইনসমূহ	ফরমালিনের মাত্রা -০	ফরমালিনের মাত্রা : ১.২৯+০.০১		-
টমেটো (সেগুনবাগিচা কাঁচাবাজার)	ফরমালিনের মাত্রা -০	ফরমালিনের মাত্রা : ২.৮০+০.১২		-
ফুলকপি	-	-	ফরমালিনের মাত্রা : ৫.৯৪+০.৫০	-
বাঁধাকপি	-	-	ফরমালিনের মাত্রা : ৪.৫০+০.৮৮	-
ইলিশ মাছ (মহাখালী বাজার)	-	ফরমালিনের মাত্রা : ৮.৮৫+০.২৩	-	-
রুইমাছ (মহাখালী বাজার)	-	ফরমালিনের মাত্রা : ৯.৯৭+০.৩৮		
চিংড়ি মাছ (মহাখালী বাজার)	-	ফরমালিনের মাত্রা : ৮.২২+০.০৩		
দুধ, (শান্তিনগর বাজার)	-	ফরমালিনের মাত্রা : ১.৭১+০.০১		ফরমালিনের মাত্রা : ০.১০২
জুস (ফ্রুটিকা) (শান্তিনগর বাজার)	-	ফরমালিনের মাত্রা : ৩.০৯+০.৩০		ফরমালিনের মাত্রা : ০.১৪১

উল্লেখ্য যে, বিএসটিআই কেবল মাত্র ফলের ফরমালিনের অস্তিত্ব নির্ণয় করে থাকে এবং বিসিএসআইআর শুধুমাত্র তরল জাতীয় খাদ্য ও মাছের ফরমালিন সনাক্তকরণের কাজ করে থাকে।

সুতরাং উপরের টেবিলের ফলাফল হতে এটা সুস্পষ্ট যে, একই নমুনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণাগারের পরীক্ষার ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন/অসামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ- বিএসটিআই এর পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় কোন ফলমূলেই ফরমালিনের উপস্থিতি নেই, কিন্তু এনএফএসএল এর প্রদত্ত ফলাফলে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ফরমালিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দুধ ও জুসের ক্ষেত্রে বিসিএসআইআর খুব সামান্য পরিমাণ ফরমালিনের উপস্থিতি দেখালেও, এনএফএসএল এর প্রতিবেদনে তাৎপর্যপূর্ণ ফরমালিনের উপস্থিতি উল্লেখ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ বিভিন্ন গবেষণাগারের পরীক্ষণের সক্ষমতা একরকম নয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সেই সাথে কারিগরি সক্ষমতারও অভাব রয়েছে।

ফলাফলঃ এক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর আস্থা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে এবং আইনগত প্রয়োগও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

সুপারিশঃ ঃ বিভিন্ন গবেষণাগারের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ, পরীক্ষা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড স্থির করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.৩ঃ ফরমালিন সনাক্তকরণের জন্য মাত্র দু'ধরণের কিটস রয়েছে কিন্তু কিটস্ দু'টির অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে এদের সংখ্যাও অপ্রতুল।

বিবরণঃ বিসিএসআইআর কর্তৃক একটি ফরমালিন কিটস্ এর উন্নয়ন ও প্রচলন করা হয়েছে এবং অন্য দিকে ডিজিটাল মিটার জেড-৩০০ নামের আরও একটি টেষ্টিং কিটস এরও প্রচলন রয়েছে। কিন্তু উভয় কিটস এরই বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

কিটস এর প্রাপ্যতা ও মূল্য-

পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত কিটস্	প্রাপ্যতা	মূল্য (প্রতিটি)
বিসিএসআইআর কর্তৃক তৈরীকৃত ফরমালিন কিটস্	মাঠ পর্যায়ের মৎস্য কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা পর্যায়ে।	২১০ টাকা
ডিজিটাল মিটার Z-300	মৎস্য কার্যালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কার্যালয় এবং কিছু বাজার কমিটি পর্যায়ে। মাঠ পর্যায়ে এদের সংখ্যাও অপ্রতুল আবার এর রিফিলগুলোও বেশ ব্যয়বহুল।	১,২৪,০০০ টাকা

বিসিএসআইআর কর্তৃক উন্নয়নকৃত ফরমালিন কিটস ঃ এই কিটস্টি মাছে ফরমালিনের উপস্থিতি সনাক্তকরণের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এটি ২০০৭ সালে বাজারজাত করা হয় এবং এর বাজার মূল্য ২১০ টাকা। ফরমালিনের উপস্থিতি চিহ্নিত করার জন্য এটি জনপ্রিয় প্রযুক্তি তবে এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন-

- ফরমালিনের মাত্রা ০.৫ পিপিএম এর নীচে থাকলে এটি ফরমালিনের উপস্থিতি সনাক্ত করতে পারে না,
- ইনজেকশনের মাধ্যমে যদি মাছের শরীরের ভিতরে ফরমালিন দেওয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রে এটি ফরমালিনের উপস্থিতি সনাক্ত করতে পারে না।

বিসিএসআইআর কর্তৃক উন্নয়নকৃত কিটস্

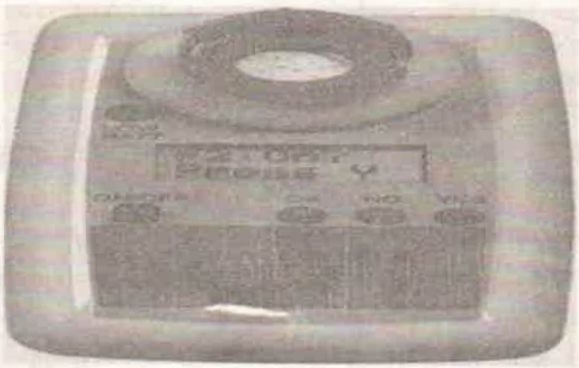

জেড-৩০০ মিটার

ডিজিটাল মিটার জেড-৩০০ ঃ এই মিটারটি মৎস্য অধিদপ্তরের "মাছ সংরক্ষণের ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম" প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। এটি মূলত তৈরী করা হয়েছে, পরিবেশের ফরমালডিহাইড সনাক্তকরণের জন্য। প্রায় ২ বছরের অধিক সময় ধরে আমাদের দেশে এটি খাদ্যে ফরমালিনের উপস্থিতি সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিসিএসআইআর এর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাদ্যে ফরমালিনের উপস্থিতি মূল্যায়নের জন্য এটি যথাযথ মিটার নয়। তাজা ও ভিজানো ফলমূলের ক্ষেত্রে সময়, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার ওপর জেড-৩০০ মেশিনটির ফরমালডিহাইড সনাক্তকরণের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এছাড়াও যে পদ্ধতিতে মিটারটি ব্যবহার করা হয় সেটাও বিজ্ঞান সম্মত নয়। নিরীক্ষা দল সরেজমিনে যাচাইকালে দেখতে পায় যে, মৎস্য বিভাগের পরিদর্শকগণ সাধারণতঃ জেড-৩০০ মিটারসহ যে খাদ্যের ফরমালিন সনাক্ত করা হবে তা একটি পলিথিন ব্যাগে ঢুকিয়ে ফরমলিনের মাত্রা পরিমাপ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর পরিচালক (পুষ্টি) জনাব মনিরুল ইসলাম এর মতে - ফলমূল, শাকসবজি ও মাছকে যদি পলিথিনের ব্যাগে রাখা হয় তবে এর পলি ইথিলিন গ্লাইকোল খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসে যা কিনা মিটারে ফরমালিন সনাক্তকরণের ফলকে প্রভাবিত করে।

১৭/৬/২০১৪ তারিখে পটুয়াখালীতে নিরীক্ষা দলের উপস্থিতিতে ডিজিটাল মিটারের সাহায্যে মাছের ফরমালিনের মাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে।

২৯/৬/২০১৪ তারিখে রাজশাহীতে নিরীক্ষা দলের উপস্থিতে ডিজিটাল মিটারের সাহায্যে খেজুরের ফরমালিনের মাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে।

সুতরাং উপরে উল্লেখিত উভয় প্রযুক্তির মাধ্যমে ফরমালিন সনাক্তকরণের যে ফলাফল পাওয়া যায় তা বিভিন্ন কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এরপরও এগুলো ব্যবহারের ফলে ভেজাল সনাক্ত হচ্ছে না অথবা প্রাপ্ত ফলাফল গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

- মাঠ পর্যায়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে মাত্র একটি ডিজিটাল মিটার রয়েছে। একজন জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অধীনে গড়ে পাঁচ বা তার অধিক উপজেলা মৎস্য কার্যালয় রয়েছে। সুতরাং একটি মাত্র মেশিন দিয়ে সমগ্র জেলার মাছের বাজারের ফরমালিন পরীক্ষা করা অসম্ভব। এছাড়াও উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম জেলার ডিজিটাল মিটার দীর্ঘদিন যাবত অকার্যকর অবস্থায় আছে এবং বিসিএসআইআর ফরমালিন কিটস যদিও দামে কম তারপরও এটি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি কেননা এগুলো ব্যবহার করা সহজ নয় এবং সন্তোষজনক ফলাফলও অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

- বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক এর সহায়তায় এফবিসিসিআই ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১১টি বাজারে ফরমালিন সনাক্তকরণ কিটস্ প্রেরণ করেছিল এবং নির্দিষ্ট সেসব বাজারকে ফরমালিন মুক্ত বাজার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল,পরবর্তীতে আরও কিছু বাজার যেমন-মালিবাগ বাজার, মিরপুর শাহআলী বাজার, উত্তরা সমবায়

বাজার, বনানী বাজার, বাদামতলী ফলের বাজার এবং নিউমার্কেট বনলতা বাজারকে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর ফরমালিন মুক্ত বাজার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যে সব বাজারে কিটস্ প্রেরণ করা হয়েছিল; সে সব বাজার কর্তৃপক্ষের প্রতিদিনই মাছের ফরমালিনের সনাক্তকরণের পরীক্ষা করার কথা থাকলেও বাস্তবে দেখা যায়, ঢাকা শহরের ঐ ১১টি সবজি বাজারের মধ্যে অন্তত চারটি বাজার মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজার, শান্তিনগর বাজার, মহাখালী বাজার, কাপ্তান বাজার তা নিয়মিত করেনি। অধিকন্তু বাজার মনিটরিং কমিটির দূর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে মাসে মাত্র দু'থেকে চারবার ফরমালিন সনাক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সে কারণে এফবিসিসিআই টাউনহল এবং মহাখালী বাজার কমিটিকে কিটস্গুলো ফেরত দেয়ার জন্য চিঠি দিয়েছে কিটস্গুলো যথাযথভাবে ব্যবহার না করার জন্য। এর মধ্যে কিটস্গুলোর সেন্সর রিফিলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও অধিকাংশ বাজারেই এসব সেন্সর রিফিল পরিবর্তন করা হয়নি। আমিনবাগ কো-অপারেটিভ মার্কেট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-ফরমালিন সনাক্তকরণ মিটারের সেন্সর রিফিলের "উচ্চমূল্যের" কারণে অধিকাংশ বাজার তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। প্রতি ছয় মাসে সেন্সর রিফিল পরিবর্তনের জন্য অন্তত পাঁচ হাজার টাকা প্রয়োজন।

অনিয়মের কারণঃ কিটস্সমূহের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তা যথাযথ বা গ্রহণযোগ্য ফলাফল প্রদান করেনা। এক্ষেত্রে পরীক্ষণের উচ্চমূল্যও একটি প্রতিবন্ধক।

ফলাফলঃ এর ফলে ফরমালিন সনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না অথবা যেসব ক্ষেত্রে সনাক্ত হচ্ছে তাও সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুপারিশঃ খাদ্য মন্ত্রণালয় ও ভোক্তা অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে, খাদ্যে ফরমালিনের সনাক্তকরণের জন্য যে সব কিটস্ ব্যবহার করা হচ্ছে বা হবে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলাফল যেন গ্রহণযোগ্য হয়; পর্যাপ্ত পরিমাণ কিটস্ যেন মাঠ পর্যায়ে থাকে তাও নিশ্চিত করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ৩.৪ঃ ফরমালিন সনাক্তকরণের জন্য সঠিক মিটার ক্রয় করা হয়নি এবং এক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় আইনও অনুসরণ করা হয়নি।

২০১১-১২ অর্থ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের "মাছ সংরক্ষণের ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম" প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্যে ফরমলিন সনাক্তকরণের জন্য ৮০টি মিটার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দরপত্র আহবান করেছিল। নিম্নে ৪টি দরপত্র অংশ গ্রহণকারীর বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ-

টেবিল

টেন্ডারার এর নাম	মিটারের বিস্তারিত	মূল্য	কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত
রিলায়েন্স সল্যুসন লিঃ	এনভায়রনমেন্টালসেন্সর জেড-৩০০	টাকা ৯৪,০০,০০০/-	নন রেসপনসিভ
ট্রেয়ার ইলেকট্রকম	এনভায়রনমেন্টাল সেন্সর জেড-৩০০	টাকা ৯৮,৮৮,৩০৭/-	রেসপনসিভ এবং ১ম নিম্ন দরদাতা
এইচ আরআইসি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল	এনভায়রনমেন্টাল সেন্সর জেড-৩০০	টাকা ৯৯,৪৮,০০০/-	রেসপনসিভ এবং ২য় নিম্ন দরদাতা
গ্লোবেক্স মার্কেটিংকোম্পানী লিঃ	এইচ এ এল এইচ এফ এক্স- ২০৫	টাকা ৯৩,২০,০০০/-	নন রেসপনসিভ

(সূত্রঃ টেন্ডার ডকুমেন্টসসমূহ)

তিনজন দরপত্র দাতাই জেড-৩০০ মিটারের জন্য প্রস্তাব করে যা মূলত বাতাসের ফরমালডিহাইডের পরিমাণ পরিমাপ করে থাকে (সূত্রঃ জেড-৩০০ মিটারের ব্রসিওউর)। অন্যদিকে চতুর্থ নিলাম দরদাতা গ্লোবেক্স মার্কেটিং কোম্পানি লিঃ এইচ এ এল-এইচএফএক্স-২০৫ নামের মিটারের প্রস্তাব করে। এই মেশিনটি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি বিষয় যেমন-খাদ্য সহ ফার্নিচার, মেঝের তক্তা, রং, নির্মাণ সমাগ্রী, প্রসাধন সামগ্রী, রঞ্জনপদার্থ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগিক দিক রয়েছে। নীচের টেবিলে জেড-৩০০ এর সাথে এইচএএল-এইচএফএক্স-২০৫ মিটারের একটি কারিগরি তুলনা দেখানো হয়েছে। যাতে সুস্পষ্ট হয় যে, এইচএএল-এইচএফএক্স-২০৫ মিটারটি ক্রয়কৃত মিটারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর।

টেবিল জেড-৩০০ এবং এইচএএল-এইচএফএক্স-২০৫ মিটারের মধ্যে কারিগরি তুলনা		
বিষয়	এইচএএল-এইচএফএক্স-২০৫	জেড-৩০০
মেজারিং রেঞ্জ	০-৩৫ পিপিএম	০-৩০ পিপিএম
রেসপনসিভ টাইম	<৩০ সেঃ	<৬০ সেঃ
সেন্সর লাইফ	৫ বছর	২ বছর
শক্তির উৎস	রিপ্লেসেবল এবং রিচার্জেবল লিথিয়াম আন ব্যাটারী	৯-ভোল্ট এ্যালাকালাইন ব্যাটারী।

এইচএএল-এইচএফএক্স-২০৫ মিটারটির সেন্সরের আয়ুষ্কাল ২ বছর এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণক না থাকায় গ্লোবেক্স মার্কেটিং কোম্পানী লিঃ কে নন-রিসপনসিভসিড করা হয়। কিন্তু মিটারটির অপারেটিং ম্যানুয়ালে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এর সেন্সরের মেয়াদ ৫ বছর।

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর অংশ-৩ বিধি ২৯ এ বলা হয়েছে-কারিগরি বিনির্দেশে কোন পণ্যের ব্যবসায়িক নাম (Trade name) পেটেন্ট, নকশা বা ধরণ, নির্দিষ্ট উৎস, দেশের নাম, উৎপাদনকারী বা সেবা সরবরাহকারীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যাবে না।
- উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি বিনির্দেশে সাধারণরূপ প্রস্তুতক্রমে উহা দরপত্রদাতাগণের নিকট সহজে বোধগম্য করে উপস্থাপন করার জন্য ক্রয়কারীর পর্যাপ্ত কারিগরী দক্ষতা না থাকে, তা হলে ক্রয়কারী কারিগরী বিনির্দেশে কোন সুনির্দিষ্ট ব্রান্ডের পণ্যের বিবরণ উল্লেখ করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে উহাতে বা একইরূপ বা সমতুল্য শব্দগুচ্ছ যোগ করতে হবে।
- ক্রয়কারী, যতদুর সম্ভব, পণ্য, কার্য বা সেবা সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী বা সুবিধাভোগীগণের নিবিড় সহযোগিতা গ্রহণক্রমে বিনির্দেশে প্রস্তুত করবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিম্নবর্নিত প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রকাশিত মানদন্ড অনুসরণ করবে, যথাঃ-
  - (ক) ইন্টারন্যাশনাল স্টান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন;
  - (খ) ইন্টার ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশন এবং,
  - (গ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইনস্টিটিউট বা অন্যকোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কোন মানদন্ড।

এক্ষেত্রে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সরকারী ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেনি। কারণ ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ টেন্ডার ডকুমেন্ট এর "টেন্ডার স্পেসিফিকেশন বা **ফরম ডি-৩ এ, যে স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করে তা হুবহু জেড-৩০০ মিটারের সাথে সম্পর্কিত**। অর্থাৎ প্রকিউরমেন্ট অথরিটি মিটারটি ক্রয়ের পূর্বেই ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যদিও এক্ষত্রে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছিল।

যার নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো- .

বিষয়	টেন্ডার ডকুমেন্টস এর ফরম ডি-৩ এর বর্ণনা	জেড-৩০০ মিটারের ব্রসিওর এর বর্ণনা
সেন্সর টাইপ	ইলেকট্র কেমিকেল	ইলেকট্র কেমিকেল
মেজারিং রেঞ্জ	০-৩০ পিপিএম	০-৩০ পিপিএম
সর্বোচ্চ ওভারলোড	৩৪ পিপিএম	৩৪ পিপিএম
রিসোলিউশন	.০১ পিপিএম	.০১ পিপিএম
সেন্সর লাইফ	২ বছর	২ বছর
রিসপন্স টাইম	২৬০সেকেন্ড	২৬০ সেকেন্ড
অপারেটিং তাপমাত্রা	২০থেকে+৪০ ডিগ্রী সেঃ	২০থেকে+৪০ ডিগ্রী সেঃ
রিলোটিড হিউমিডিটি	১৫-৯০% কনডেন্সসিং	১৫-৯০% কনডেন্সসিং
এলার্ম অডিবল	অডিবল ৮০ ডিবি	অডিবল ৮০ ডিবি
ডাইমেনশন	৪.৭৫"×২.৫"×১.৫"	৪.৭৫"×২.৫"×১.৫"
ওজন	১৭৫ গ্রাম	১৭৫ গ্রাম
শক্তির উৎস	৯-ভোল্ট এ্যালাকালাইন ব্যাটারী	৯-ভোল্ট এ্যালাকালাইন ব্যাটারী

অর্থাৎ কোন পার্থক্য নেই।

কাজেই এটা ভাবা অবাস্তব কিছু নয় যে, প্রকিউরিং এনটিটি নির্দিষ্ট ফার্মের কাছ থেকে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই নিয়ে রেখেছিল। এ উদ্দেশ্যে, প্রথমত সচেতনভাবেই পিপিআর এর সংশ্লিষ্ট বিধি মানা হয়নি **এবং দ্বিতীয়ত পুনরায় টেন্ডার আহবান না করে ভুল মিটার ক্রয় করে। সুতরাং, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সর্বনিম্ন দরপত্র প্রদানকারীকেই বাদ দেয়া হয়নি বরং ১ কোটি টাকা মূল্যে বেশী দামে ভুল মিটার ক্রয় করা হয়েছে।**

অনিয়মের কারণ ঃ পিপিআর-এর বিধান পালন না করা এবং প্রকিউরিং এনটিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ফলাফল ঃ পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য দরপত্রে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হয়নি।

- উপযুক্ত মিটার নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি।
- সঠিক মিটার ক্রয় না করার ফলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

সুপারিশঃ ক্রয় বিধি অনুসরণ না করার জন্য ক্রয় কর্তৃপক্ষ মৎস অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সঠিক প্রযুক্তি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬/০৭/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ৩১/১০/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
মোহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভূঁঞা
মহাপরিচালক
পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

পরিশিষ্টসমূহ

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পরিশিষ্ট নং	পৃষ্ঠা নং
১	নিরীক্ষাদল কর্তৃক খাদ্য দ্রব্যের বাজার পরিদর্শন এবং ইউনিট সমূহের নমুনা পরীক্ষণ।	১	৪৩-৪৫
২	নিরীক্ষা ইস্যু, উদ্দেশ্য ও নিরীক্ষা নির্নায়ক (Criteria)	২	৪৭-৪৮
৩	নিরীক্ষিত সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সক্ষমতা	৩	৪৯
৪	বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	৪	৫১

পরিশিষ্ট -১

নিরীক্ষাদল কর্তৃক খাদ্য দ্রব্যের বাজার পরিদর্শন এবং ইউনিট সমূহের নমুনা পরীক্ষণ।

প্রথম স্তর ঃ মন্ত্রণালয় পর্যায়				
অবস্থান	অডিটি অর্গাইজেশন	কর্মদিবস	জনদিবস	যৌক্তিকতা
ঢাকা	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০১	১× ৩	বর্তমান নোডাল মন্ত্রণালয়
ঢাকা	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০২	২× ৩	পূর্ববর্তী নোডাল মন্ত্রণালয়
ঢাকা	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১	১× ৩	মাছে ফরমালিনের অবৈধ ব্যবহার রোধে অসংখ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
ঢাকা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১	১× ৩	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন
ঢাকা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০২	২× ৩	স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় ও নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত।
ঢাকা	আইন মন্ত্রণালয়	০১	১×৩	সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত।
মোট	০৬	০৮	২৪	
দ্বিতীয় স্তরঃ অধিদপ্তর পর্যায়				
অবস্থান	অডিটি অর্গাইজেশন	কর্মদিবস	জনদিবস	যৌক্তিকতা
ঢাকা	বিএসটিআই	০২	০২×২	কারিগরি সক্ষমতার কারণে
ঢাকা	বিসিএসআইআর	০১	০১×২	কারিগরি সক্ষমতার কারণে
ঢাকা	ডিজি হেলথ্	০২	০২×৫	মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকে।
ঢাকা	সি.আর.পিডি	০২	০২×৩	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষনের দায়িত্ব
মোট	০৭	৭	২২	
তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর ঃ প্রকল্প ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান				
ঢাকা বিভাগ				
অবস্থান	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	কর্মদিবস	জনদিবস	সত্যতা প্রমাণ
ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	০২	২×৫	অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ শহর
ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	০২	২×৫	অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ শহর
ঢাকা	আই পিএইচ (নিরাপদ খাদ্যে উন্নয়ন প্রকল্প)	০৪	০৪×৫	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরার কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত
ঢাকা	মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন	০৪	০৪×৩	মাছের ফরমালিন ব্যবহাররোধের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত
ঢাকা	১০টি বাজার	০২	০২×৫	বাস্তব যাচাই এর জন্য।
মোট	৫	১৪	৬২	

সিলেট বিভাগ				
অবস্থান	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	কর্মদিবস	জনদিবস	সত্যতা প্রমাণ
সিলেট	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং ৩টি বাজার পরিদর্শন	০৩	০৩×৫	পাহাড়ী এলাকা এবং কমলা উৎপাদন অঞ্চল
সিলেট	ডি.এফ.ও			পাহাড়ী এলাকা এবং কমলা উৎপাদন অঞ্চল
শ্রীমঙ্গল	ইউ.এফ.ও	০৩	০৩×৫	পাহাড়ী এলাকা এবং কমলা উৎপাদন অঞ্চল
শ্রীমঙ্গল	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স			পাহাড়ী এলাকা এবং কমলা উৎপাদন অঞ্চল
শ্রীমঙ্গল	উপজেলা পরিষদ ও বাজার পরিদর্শন			পাহাড়ী এলাকা এবং কমলা উৎপাদন অঞ্চল
শ্রীমঙ্গল	ইউএনও অফিস			পাহাড়ী এলাকা এবং কমলা উৎপাদন অঞ্চল
মোট	৬	০৬	৩০	
বরিশাল বিভাগ				
অবস্থান	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	কর্মদিবস	জনদিবস	সত্যতা প্রমাণ
পটুয়াখালী	সিভিল সার্জন কার্যালয়	০৩	০৩×৫	নদী এলাকা
পটুয়াখালী	ডি.এফ.ও			নদী এলাকা
পটুয়াখালী	মেয়রের কার্যালয় এবং ২টি বাজার পরিদর্শন			নদী এলাকা
গলাচিপা	ইউ.এফ.ও	০৩	০৩×৫	নদী এলাকা
গলাচিপা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স			নদী এলাকা
গলাচিপা	উপজেলা পরিষদ ও বাজার পরিদর্শন			নদী এলাকা
গলাচিপা	ইউএনও অফিস			নদী এলাকা
মোট	৭	৬	৩০	
চট্টগ্রাম বিভাগ				
অবস্থান	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	কর্মদিবস	জনদিবস	সত্যতা প্রমাণ
চট্টগ্রাম	মেয়রের কার্যালয় এবং ৪টি বাজার পরিদর্শন	০৩	০৩×৫	বাণিজ্য নগরী ও বন্দর
চট্টগ্রাম	সিআরপিডি			বাণিজ্য নগরী ও বন্দর
চট্টগ্রাম	ডি.এফ.ও			বাণিজ্য নগরী ও বন্দর
বান্দরবান	সিভিল সার্জন অফিস	০৩	০৩×৫	দূর্গম পাহাড়ী এলাকা ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল
বান্দরবান	ডি.এফ.ও			দূর্গম পাহাড়ী এলাকা ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল
বান্দরবান	মেয়রের কার্যালয় এবং ১টি বাজার পরিদর্শন			দূর্গম পাহাড়ী এলাকা
মোট	৬	৬	৩০	

রাজশাহী বিভাগ				
অবস্থান	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	কর্মদিবস	জনদিবস	সত্যতা প্রমাণ
রাজশাহী রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং ৩টি বাজার পরিদর্শন	০৩	০৩×৫	ফল উৎপাদন অঞ্চল
রাজশাহী	বিএসটিআই			ফল উৎপাদন অঞ্চল
রাজশাহী	আরপিডি			ফল উৎপাদন অঞ্চল
রাজশাহী	ডিএফও			ফল উৎপাদন অঞ্চল
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মেয়রের কার্যালয় এবং ২টি বাজার পরিদর্শন	০৩	০৩×৫	ফল উৎপাদন অঞ্চল
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সিভিল সার্জন			ফল্ উৎপাদন অঞ্চল
চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিবগঞ্জ	ডিএফও			ফল উৎপাদন অঞ্চল
শিবগঞ্জ	সোনামসজিদ বন্দর	০৩	০৩×৫	স্থল বন্দর
শিবগঞ্জ	ইউএফও			স্থল বন্দর
শিবগঞ্জ	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স			স্থল বন্দর
শিবগঞ্জ	মেয়রের কার্যালয় এবং ১টি বাজার পরিদর্শন			স্থল বন্দর
শিবগঞ্জ	ইউএনও অফিস			স্থল বন্দর
মোট	১২	০৯	৪৫	

সারসংক্ষেপ

সর্বমোট ইউনিট	সর্বমোট বাজার পরিদর্শন	সর্বমোট কর্মদিবস	সর্বমোট জনদিবস
৪৯	২৮	৫৬	২৪৩

পরিশিষ্ট-২

নিরীক্ষা ইস্যু, উদ্দেশ্য ও নিরীক্ষা নির্নায়ক (Criteria)	
ইস্যু-১ খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ক্ষতিকর ব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় আইন ও সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে কিনা ?	
নিরীক্ষা উদ্দেশ্য	**নিরীক্ষা নির্ণায়ক**
এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতিমালা আছে কিনা ?	স্বাস্থ্য নীতি খাদ্য নীতি পলিসি ডকুমেন্ট
এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামো রয়েছে কিনা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় আইন, এর প্রয়োগ ও কেইস সমূহের দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা কার্যকর কিনা ?	নিরাপদ খাদ্য আইন, ১৯৫৯ নিরাপদ খাদ্য আইন, ১৯৬৭ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০০৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণের মাধ্যমে সমন্বিত ভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন কেন্দ্রিয় সংস্থা কাজ করছে কিনা ?	নীতিমালা কেবিনেটের সিদ্ধান্ত নিরাপদ খাদ্য আইন, ১৯৫৯ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০০৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ রুলস অব বিজনেস মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর
ইস্যু-২ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা ?	
নিরীক্ষা উদ্দেশ্য	**নিরীক্ষা নির্ণায়ক**
সম্পূর্ণ খাদ্য চেইনকে মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়েছে কিনা অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন সমষ্টিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?	খাদ্য চেইনের সংজ্ঞা ভূমিকা
এক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়েছে কিনা অর্থাৎ যথেষ্ঠ তহবিল, যথাযথ লোকবল ও অন্যান্য লজিষ্টিকস দেয়া হয়েছে কিনা ?	টিওই বাজেট জব স্পেসিফিকেশন ক্রয় পরিকল্পনা
বাস্তবায়নের কোন রেসপনসিভ বা রিঅ্যাকটিভ আচরণ করা হচ্ছে কিনা ?	পলিসি প্রোগ্রাম কার্যক্রম
এক্ষেত্রে রিস্ক বেইজড এ্যাপ্রোচ প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা?	পরিকল্পনা কার্যপদ্ধতি

নিরীক্ষা উদ্দেশ্য	নিরীক্ষা নির্ণায়ক
এক্ষেত্রে প্রতিরোধের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন এবং এ কর্মকাণ্ডে মিডিয়া ও সুশীল সমাজকে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে কিনা ?	পলিসি প্রোগ্রাম কার্যক্রম
এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যকরী জনবল ও আইনগত কাঠামো রয়েছে কিনা ?	টিও ই
ইস্যু-৩ খাদ্যে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ভেজাল রোধে প্রয়োজনীয় কারিগরী সক্ষমতা আছে কিনা ?	
নিরীক্ষা উদ্দেশ্য	নিরীক্ষা নির্নায়ক
এক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকি সমূহ দক্ষতার সাথে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা রয়েছে কিনা ?	নীতি গবেষণাগারের সক্ষমতা উন্নত ব্যবস্থাসমূহ
এক্ষেত্রে কারিগরি বিষয়সমূহ সহজলভ্য ও সুলভ কিনা?	নীতি উন্নত ব্যবস্থাসমূহ কারিগরি বিষয়সমূহ

পরিশিষ্ট-৩

নিরীক্ষিত সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সক্ষমতা

স্থানীয় সংস্থার নাম	স্যানিটারী ইন্সপেক্টরদের সংখ্যা	বাজারের সংখ্যা	ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড সনাক্তকরণের সক্ষমতা	রিপোর্টিং সিস্টেম	ট্রেনিং পলিসি	লিগ্যাস সিস্টেম	অভিযান পরিচালনার সংখ্যা
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ	১০		ডিজিটাল মিটার ১টি ও কার্বাইড সনাক্তকরণের সক্ষমতা নেই।	কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্টিং সিস্টেম নেই।	কোন প্রশিক্ষণ নীতিমালা নেই।	আছে	মোবাইল কোর্টের সাথে সমন্বিত ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর	১০		ডিজিটাল মিটার ১টি ও কার্বাইড সনাক্তকরণের সক্ষমতা নেই।	কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্টিং সিস্টেম নেই।		আছে	ঐ
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	১১ জনের মধ্যে ৪ জন কর্মরত	২২	কোন সক্ষমতা নেই।	কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্টিং সিস্টেম নেই।		আছে	ঐ
সিলেট সিটি কর্পোরেশন	২	১২	কোন সক্ষমতা নেই।	কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্টিং সিস্টেম নেই।		নেই	ঐ
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	৪	৯	কোন সক্ষমতা নেই।	কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্টিং সিস্টেম নেই।		নেই	ঐ
পটুয়াখালী পৌরসভা	৩		কোন সক্ষমতা নেই।	কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্টিং সিস্টেম নেই।		নেই	ঐ
শ্রীমঙ্গল পৌরসভা	১		কোন সক্ষমতা নেই।	কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্টিং সিস্টেম নেই।		নেই	ঐ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৌরসভা	১		কোন সক্ষমতা নেই।	কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্টিং সিস্টেম নেই।		নেই	ঐ

পরিশিষ্ট-৪

শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উদাহরণ

সংস্থার নাম	গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা		প্রবিধান
	জরিমানা (গড় টাকা)	জেল	
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (২০১২-১৩)	১০০০-১২০০০	-	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, ২০০৯, অনুসারে এই ধরণের ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ের শাস্তির প্রবিধান হলো ৩ বছরের জেল বা ২ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই।
বিএসটিআই (২০১২-১৩)	১০,০০০=>	তিন জনকে ১ বছর করে জেল	
ডিএফও চট্টগ্রাম ২০১৩	১০,০০০=>	-	
ডিএফও কক্সবাজার	৫০০০=>	-	

বাঃসঃমুঃ-২০১৬-২০১৭/২৭৭৫কম/এ—৭১০ বই, ২০১৬।